A Literary Journal of Sir Gurudas Mahavidyalaya

আয়ুষ্

AYUSH

2021-2023

আয়ুস্

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের
বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা

২০২১ - ২০২২
২০২২ - ২০২৩
যুগ্ম সংখ্যা

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়
৩৩/৬/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, মুরারিপুকুর, উল্টোডাঙা
কলকাতা - ৭০০০৬৭
www.sirgurudasmahavidyalaya.com

‘AYUSH’, a literary journal of
Sir Gurudas Mahavidyalaya, Kolkata-67
Joint Issue, 2021-2023

আয়ুস্

• উপদেষ্টা •
ড. মণিশঙ্কর রায় (অধ্যক্ষ)
শ্রী দেবাশিস বর্মন (সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ)
ড. পারমিতা হালদার
ড. প্রশান্ত কুমার দে
ড. রত্না লোধ
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী (ও.সি)

• যুগ্ম সম্পাদক •
ড. অরুণাভ সিনহা
ড. প্রশান্ত ঘোষাল

• সম্পাদকমণ্ডলী •
ড. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. শিঞ্জিনী বসু
ড. কাজল দে
ড. মীনাক্ষী গোস্বামী
ড. শুভংকর সাহা
শ্রীমতী তনুশ্রী বসু পাকড়াশী
শ্রী চন্দন আঢ্য
শ্রীমতী মৌসুমী দত্ত (ছাত্র প্রতিনিধি)
শ্রীমতী অঙ্কুশা ঘোষ (ছাত্র প্রতিনিধি)

• আঙ্গিক বিন্যাস ও প্রচ্ছদ •
শ্রী শুভেন্দু দাশমুন্সী

• মুদ্রক •
জেপিএস ইনফোমিডিয়া
কলকাতা - ৭০০০৪৬

AYUSH

LITERARY JOURNAL OF SIR GURUDAS MAHAVIDYALAYA JOINT-ISSUE 2021-2023

আয়ুস্

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা
যুগ্ম সংখ্যা
২০২১-২০২৩

সূচিপত্র

অধ্যক্ষের কলম | ৫
সম্পাদকের কলম | ৭
শিক্ষক-সংসদ-সম্পাদকের বক্তব্য | ৮
শিক্ষাকর্মীবন্ধুর কলম | ৯
ছাত্রদের কলম | ১০

ক বি তা র পা তা

দুটি কবিতা | অধ্যাপক ফরিদ মণ্ডল | ১২
মহিমা | দীপাঞ্জন মিত্র | ১৩
আমার মৃত্যুর পর | তিতলী বসাক | ১৩
জীবন মানে? | মাধবী সরকার | ১৪
আসল জীবন | সঞ্চিতা মাইতি | ১৪
নেতাজি | অরুণ রায় | ১৫
কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন | রিয়া প্রামাণিক | ১৫
প্রকৃতি | অরিত্র ঘোষ | ১৬
Oh ! My Moon ! | Aritra Chatterjee | ১৬
For me, where I think the road ends, it begins afresh | Manisha Podder | ১৭
Colour | Deepshikha Dey | ১৮
A Friend Like You | Debanjan Bhowmick | ১৮
He Who Thinks He Can, He Can | Pallabi Jana | ১৯
जब हम बड़े होंगे | মো॰ তোসীফ খান | ১৯
অবসর সমাচার | ২০

প্র ব ন্ধ নি ব ন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিক | প্রভাস মণ্ডল | ২২

"ত্যজ প্রেয় — ভজ শ্রেয় নিত্য সুখ-লভিবারে।" | ড. সুকুমার দেব | ২৫

পালকির আড়ালে | সঞ্চিতা বসু | ৩১

রহস্যময় বাল্ট্রা দ্বীপ | গোপাল ব্যানার্জী | ৩৪

চিরদিনের বিনোদিনী | টিনা পাল | ৩৬

জন রলস-এর ন্যায় তত্ত্ব | সুমিতা দেবনাথ | ৪১

বেদ - উপনিষদে দেবী দুর্গা | ডঃ কাজল দে | ৪৩

Akhteruzzaman Elias' Khwabnama : Book of Unfinished Dreams | Prof. Shinjini Basu | ৪৭

W. W. F. – The Ferocious Fun | Abhijit Mondal | ৫৩

The Genesis of Pen | Aindrila Chowdhury | ৫৪

Indian Economy in the Face of Global Financial Crisis | Rupa Thakur | ৫৬

Global Warming | Atanu Bhanja Chowdhury | ৫৮

Role – Reversal | Pratyay Ghorai | ৬০

Of Her Disobedience | Dibyendu Sardar | ৬২

স্মৃতিয়াঁ | মো॰ তোসীফ খান | ৬৪

গ ল্পে র পা তা

সরল | কাজল মাইতি | ৬৮

এক হাজার বছর পর | রেনিকা বিশ্বাস | ৭১

Mistake | Sourav Adhikari | ৭৫

চি ত্র ঘ র

অধ্যাপক মৌমিতা আঢ্য | ৭৬

জয় নস্কর | ৭৭

উত্তম কুমার মণ্ডল | ৭৮

সুপ্রজিৎ বসাক | ৭৯

অনিকেত দাস | ৮০

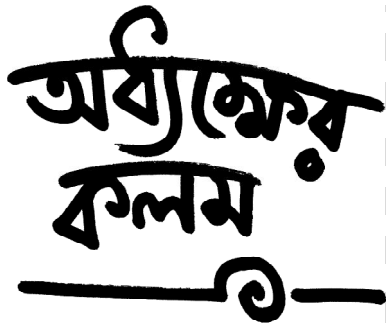

আমরা আনন্দিত, স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা আয়ুস আবার প্রকাশিত হতে চলেছে। এই শুভ সময়ে আমি তাঁদের অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আয়ুস প্রকাশিত হতে চলেছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মনের ভাব আদান-প্রদানের গুরুদায়িত্ব ধারাবহিক ভাবে বহন করে চলেছে এই পত্রিকা। এই পত্রিকা কোনও একজন ছাত্র বা ছাত্রী লেখার মধ্যে দিয়ে যেমন তার ব্যক্তব্যকে তুলে ধরতে পারে, তেমনি অন্যের লেখা থেকে তাদের বক্তব্যকেও জানতে পারে। এই পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে কলেজের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সমাজের ওপরে গিয়ে পড়ে, মানব সমাজের উন্নতি হয়।

আমি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

ড. মণিশঙ্কর রায়

সম্পাদকের কলম

মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'আয়ুস্' প্রকাশিত হতে চলেছে। বর্ষবিচারে এই সংখ্যা ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩-এর যুগ্ম সংখ্যা। একদিক থেকে আয়ুস্ মূলত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আবেগ ও মননের বাহ্যিক প্রকাশ — যা ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টি কর্মের ক্রমোন্নতির কথাই তুলে ধরবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পথ একেবারেই মসৃণ নয়। এই কর্মযজ্ঞে যথেষ্ট বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা না পড়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হল না। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পত্রিকা প্রকাশের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করি।

ড. অরুণাভ সিনহা
ড. প্রশান্ত ঘোষাল

শিক্ষক সংসদ সম্পাদকের কলম

আয়ুস্-এর নতুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। অনুরোধ এলো শিক্ষক-সংসদ-সম্পাদক হিসেবে সেই পত্রিকায় কিছু লেখার জন্য। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত নিজস্ব পত্রিকা আয়ুস্, মূলত তাদেরই লেখায় আঁকায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা। বর্তমান গোলোকায়নের যুগে গতিময়তা আমাদের এক অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমরা এখন হোয়াটসঅ্যাপ করি, ই-মেল করি, কিন্তু চিঠি লিখি না। কলমের চাইতেও কি-বোর্ডেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এই পারিপার্শ্বিকতাতেও যখন দেখি আয়ুস্-এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা কলম নিয়ে ভাবতে বসেছে, কিছু না কিছু লিখছে, পেনসিল হাতে ভরিয়ে ফেলছে সাদা পৃষ্ঠা, যখন আপ্লুত না হয়ে উপায় থাকে না। তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়ে ফেলার পরেও অনেক কিছু টিকে আছে আমাদের শিরায় শিরায়। এই টিকে থাকার এবং টিকিয়ে রাখার প্রত্যয়টুকু নিয়ে এগিয়ে চলুক আয়ুস্।

অধ্যাপক দেবাশিস বর্মন

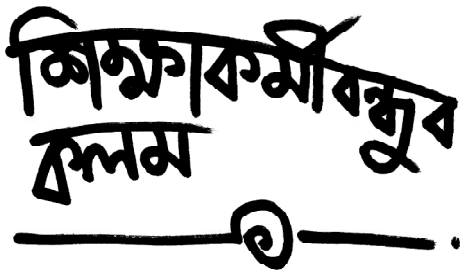

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'আয়ুস্'-এর নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই প্রার্থনা করি। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকার আত্ম-প্রকাশ ঘটে চলেছে, শিক্ষা-কর্মী-সংসদের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইলো।

সৈকত মজুমদার
শিক্ষা-কর্মী-সংসদ-এর পক্ষে

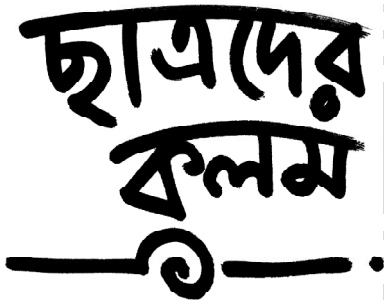

নবকলেবরে মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'আয়ুস্'-এর বর্তমান যুগ্মসংখ্যা ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। এই সাহিত্য পত্রিকাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে ছাত্র-সংসদ সবসময়েই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা পালন করবে ছাত্র-প্রতিনিধি হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। সবাইকে শ্রদ্ধা ও নমস্কার।

জুনেইদ আহমেদ
সৃজা সরকার
ছাত্র প্রতিনিধি

কবিতার কথা

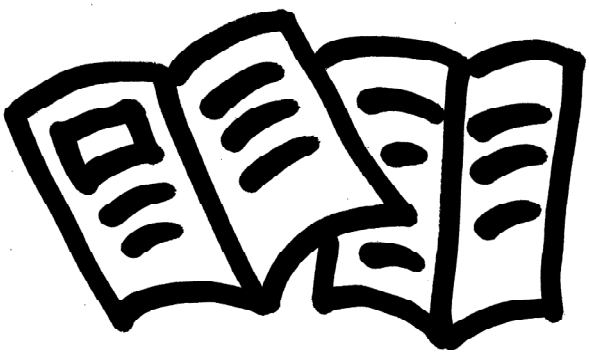

দুটি কবিতা

অধ্যাপক ফরিদ মণ্ডল
ইংরাজি বিভাগ

যুদ্ধ প্রেম মৃত্যু

প্রবাহিত জীবনের কৈশোর শেষ, যৌবন রেশ —
শিশির ভেজা গোলাপ ক্ষেত, মধুর কল্পদেশ,
হাতছানি দেয় —
লাস্যময়ী হাসি, রামধনু বেশ,
প্রজাপতির পাখা, পরিপাটি কেশ,
লাবণ্যভরা দেহ, শ্লেষপূর্ণ চোখ,
অনুরাগী মুখ — চন্দ্রিমা চাঁদ,
খুঁজে খুঁজে যায় উন্মুক্ত আকাশ,
দখিনা বাতাস, পাহাড়ের গায়;
দোতলার ছাদ, শীতের বইমেলা;
বইয়ের পাতায়।
তৃষ্ণার্ত মন, চায় প্রতিক্ষণ —
সুগন্ধী রোমান্স, নকশা রুমাল,
মধুর বাক্যালাপ, রক্তিম গোলাপ,
চিত্রিত কার্ড, অমৃত ভাষণ,
বিশ্বগ্রাসী চোখে বিস্ময়ঝলক —
গিলে খেতে চায় তিলোত্তমা লোক,
তুচ্ছ করি ভয়, যত সংশয় —
টিকিধারী ঘুর্ঘু, পাশ্চাত্য শকুন
ছিনিয়ে আনতে চায় একখানি মুখ—
খুব প্রিয় তার — সে তার প্রিয়ার
আর একটি ছবি, নতুন এক রবি,
হণ্যে হয়ে বেলা —
শারদীয়া, সারস্বত, হোলির মেলা,
কলেজক্যাম্পাস, হোটেল কবি ঘর, সমুদ্র সৈকত,
বসন্তের রঙে হৃদয়ের খেলা,
অবশেষে নির্জন ভিক্টোরিয়া, নন্দন,
গঙ্গাতীর, চিড়িয়াখানা, উদ্ভিদগার্ডেন
অথবা রবীন্দ্রসদন —
অরণ্যে রোদন —
অপুষ্ট প্রেম, ঝড়ে পড়ে হায়
ধূসর অন্তর্জলি যাত্রায় —
কর্মহীন হতাশার অন্ধকারে ডুবি, অর্ধবৃত্তাকার,
বিনিদ্র রজনীর গভীর বিশ্বাস,
গোঙরানো বুকে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দাগ রয়ে যায় স্মৃতির পাতায়
গোপন ইতিহাস, চরম পরিহাস।

তুমি কবিতা

চাঁদ এখন গ্রহণগ্রস্ত
চারিদিকে রক্তাক্ত অন্ধকার,
হায়নারা লুকিয়ে আছে ঝোপে;
বারুদের স্তূপে ধ্বসে ক্রন্দনরত
বসুন্ধরা —
প্রয়োজন মুষ্টিবদ্ধ হাত,
তাই কবিতা লেখার অবসর
নয় এটা, কারণ, গোল্লায় গেছে
গোটা দুনিয়াটা। তবুও
কবিতা লেখার বাসনা দুর্নিবার;
পেশা নয় —
কেবলই এটা নেশা।
চাঁদ এখন মধুচন্দ্রিমা নয়;
মানে এখন দুশ্চিন্তার রাশ —
কবিতা কেবল —
কবিতাই অবকাশ।

কবিতার কথা

মহিমা

দীপাঞ্জন মিত্র
বাংলা বিভাগ

ঈশ্বর তুমি মঙ্গলময়
বিরাজ করো সর্বময়।
তোমার অপার মহিমায়
ধন্য হয় আমাদের হৃদয়।
তুমি যে করুণাময়ী,
প্রণাম নাও ওগো দয়াময়ী।
জগতের প্রভু তুমি হে ক্ষমাময়ী,
তোমার আশিসে হই মোরা জয়ী।
থাকো তুমি প্রতিটি জীবের অন্তরে,
তবু মানুষ খোঁজে তোমায় মন্দিরে মন্দিরে।
করলে জীবের সেবা,
হয় যে তোমারই সেবা।

আমার মৃত্যুর পর

তিতলী বসাক
ইতিহাস বিভাগ

হে প্রকৃতি, যখন আমি নেব বিদায়
সূর্য না যেন অন্ধকারে ছায়,
ভূমি যেন ফসল দেয় বিপুল,
মানুষের জীবন যেন চলে অনুকূল।
কথা দাও, তুমি করবে না পৃথিবীর অনাদর
কথা দাও, স্নিগ্ধ রাখবে তোমার অন্তর।
কাঁদবে না তুমি, করবে না শোকগ্রস্ত মন
দায়িত্বজ্ঞান ভুলে গিয়ে করবে না মোরে স্মরণ।
প্রকৃতি তুমি সহ্য করো মানুষের আঘাত,
অসহায় তারা, ক্ষমা করো তাঁদের অপরাধ।
তুমি মানব জীবনকে রক্ষা করো প্রতিক্ষণ,
যেন তাঁদের না হয় অপঘাতে মরণ।।

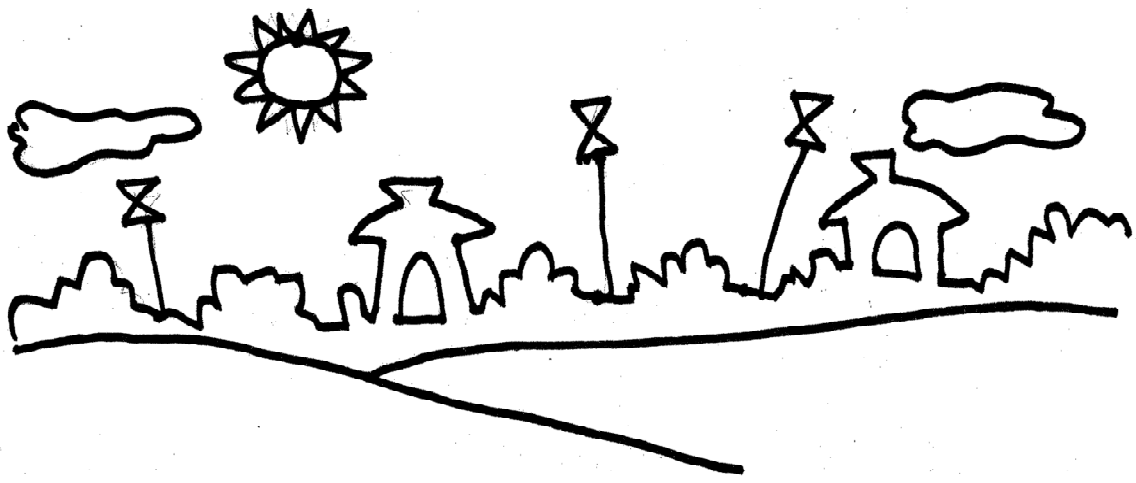

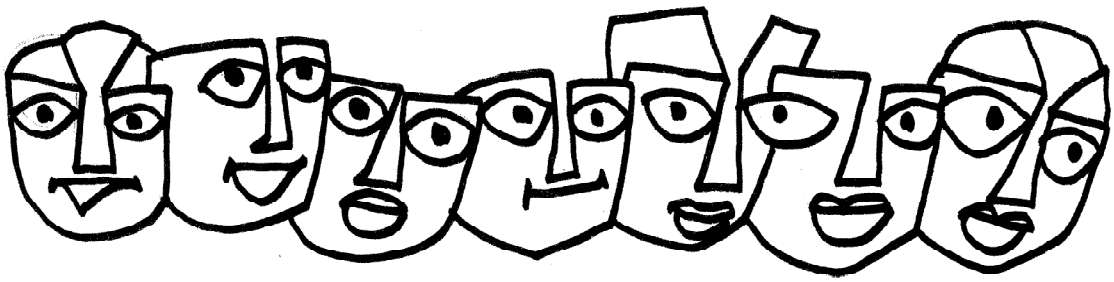

জীবন মানে?

মাধবী সরকার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জীবন মানে অল্প সময় অনেক কিছু করা,
জীবন মানে একটু হাসি একটু মনমরা।
জীবন মানে চাওয়া-পাওয়া সবকিছুর মধ্যে
জীবন মানে সফল হওয়া সবকিছুর ঊর্ধ্বে।
জীবন মানে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন পূরণ করা,
জীবন মানে সব সময় নিজেকে প্রমাণ করা।
জীবন মানে ভালোবাসার সবটুকু দেওয়া,
জীবন মানে কারো কাছে একটু না চাওয়া।
জীবন মানে রাগ-অভিমান, ছিনিমিনি খেলা,
জীবন মানে বাঁচা-মরা হতাশা আর জ্বালা,
জীবন মানে কষ্ট হলেও অনেক ভালোবাসা,
জীবন মানে রামধনু রঙ স্বপ্ন নিয়ে জানা।।

আসল জীবন

সঞ্চিতা মাইতি
শিক্ষা বিভাগ

হাসতে হাসতে কাঁদতে হবে
কান্না ফেলে হাসি,
তাকেই বলে আসল জীবন
তাকেই ভালোবাসি।
থাকে না আঁধার জীবন ঘিরে
হোক না মরুভূমি,
দুঃখের সাগর পেরিয়ে উঠবে তীরে তুমি।
আবার যখন আলোয় আলোয়,
জীবন যাবে ভরে
ভাববে নাকো থাকবে আলো
সারা জীবন ধরে,
মিথ্যে ভাবা দুঃখের শুধু
জীবন বিষময়,
দুঃখের ছোঁয়ায় জীবনটাই
পরম সুখের হয়।
প্রদীপ যেমন আলো ছড়ায়,
আবিরটুকু ঘিরে,
তেমনি আঁধার থাকলে তবে
জ্বলবে জীবন-হীরে।

নেতাজি

অরুণ রায়
শিক্ষা বিভাগ

এক যে ছিলেন বীর বিপ্লবী
নাম তাঁর নেতাজি।
এসেছিলেন পৃথিবীর কোলে
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে।
তেইশে জানুয়ারী জন্ম যাঁর
একটাই কথা ছিল তাঁর —
তোমরা আমায় রক্ত দাও,
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।
পরাধীনতার বাঁধন ছিন্ন করে
কোথায় তিনি গেলেন চলে।
পাওয়া গেল না তাঁর খোঁজ
না পাওয়ায় তিনি আজও নিখোঁজ,
তবু আমরা তাকে স্মরণ করি রোজ রোজ।

কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

রিয়া প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ

পঁচিশে বৈশাখ জন্ম যাহার
আজকে শ্রদ্ধা জানাবো তাহার।
সে যে আমার অন্তরের কবি
এমনও তাহার কবিতায় সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি।
তাহার অমূল্য চৈতন্যধনের সৃষ্টিকে
আজও প্রতিষ্ঠা করি আমার অন্তরের গভীরে।
যদিও নগণ্য আমি গণ্যের এই সমাজে
তবু অসহায় এ ক্ষুদ্র মনে তাহার মর্মবাণী বাজে
জানি না আজ কোথায় গেলে পাইবো তাহার দেখা
মনেরও গভীরে সাজিয়ে রেখেছি কতনা ফুলের মালা
তাহার চরণে মস্তক নত করিয়াছি আমি
আমি এক ক্ষুদ্র কিশোর তাহার চরণের দাস
তাই আজ আমরা মিলিত হবো দলে দলে
তাহার চরণ তলে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাবো সকলে।

প্রকৃতি

অরিত্র ঘোষ
বাণিজ্য বিভাগ

প্রকৃতির শান্তির সাগরে আমি ভেসে উঠছি,
মাতাল হয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর গন্ধে।
হরিণের হাসির মধুর ছন্দে আমি ভেসে গেছি,
এই বনের সুর আমাকে করে তুলেছে আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধ।
কত পাখির গীতে আমি মেশাচ্ছি,
বাতাসের মৃদু মন্দ স্পর্শ তোমার ওই বীণায়।
বৃষ্টির আবৃত্তিতে আমি সুর মেলাচ্ছি,
কত সুন্দর প্রকৃতি এই গ্রামবাংলায়।
সবুজের পালায় আমি মেশাচ্ছি,
বৃষ্টিতে ফুলের সুগন্ধ নামাচ্ছি।
গুঁড়ি গুঁড়ি আমি জলের স্পর্শ হতে চাই,
মাঝে মাঝে মেঘের কোলে লিপিবদ্ধ আমি তাই।
আমি প্রকৃতির আবর্তে কাঁদছি,
মানুষের কর্মে হারিয়ে যাচ্ছি।
বনের বৃষ্টি আমায় ভিজিয়ে দাও,
মেঘের ছায়ায় আমি ভয় পাচ্ছি।

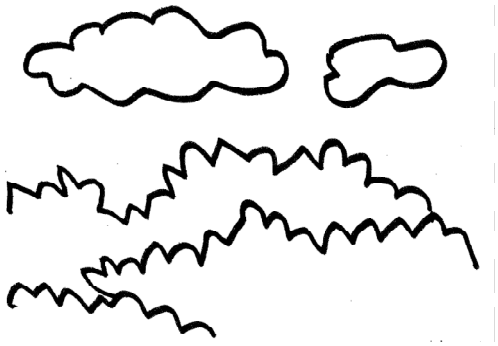

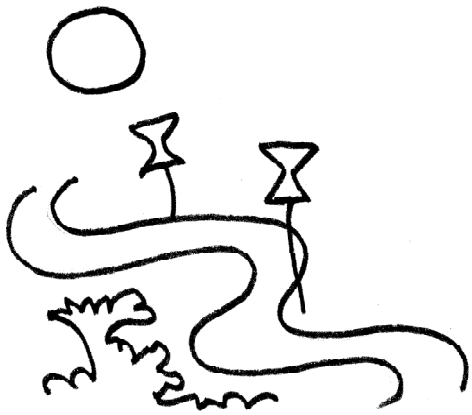

Oh ! My Moon !

Aritra Chatterjee
Dept. of English

When I first saw the moon
I thought thou were an angel from heaven
That came to Earth to be mine soon
And those dark eyes of yours match
the colour of a raven.

Do thee remember the bright Helios
at the riverside ?
Bowling his rays that slip on your face
Where those seats have been waiting
for us during tide
And there my lips wanted to be
involved with yours in a race.

Those stigmas make the moon so pale
But those little dark dots which is on your face
makes your face for my eyes so well
It feels like almighty Hath provided me with a grace

But the moon is not as bright as it used to be,
As long my heart exists it will always remember thee.

For me, where I think the road ends, it begins afresh

Manisha Podder
Dept. of Pol. Science

Beauty fades, gratitude errs, time passes
But I, on the other side, like a
State repertoire go on
As if the morbidity of Time hung upon
Me like the ammendments.

'Is there life?' 'or is it our preconceived notion ?'
'Does it stay ? Does it line ?'
I don't know the answers to the
Rhetoric, philosophic jargons –
Because I surrender to Myself
As in the word, as it goes.

The matinee show in life's theatre, no more
Attracts the juvenility
It, on the other hand, makes me
Obtrusively replete.

You might not know why I don't transcend
To Bliss, if it is there
I know that I might not seek
For I seek Happiness
I might not receive a Divine Interpolation
In the novel of my life, for this not a best seller.

But I do believe that just like Achilles
I will receive a warriors' greet
In Heaven, of course because I do believe
Achilles fought Troy and we fight
The troys of our lives.

Colour

Deepshikha Dey
Dept. of English

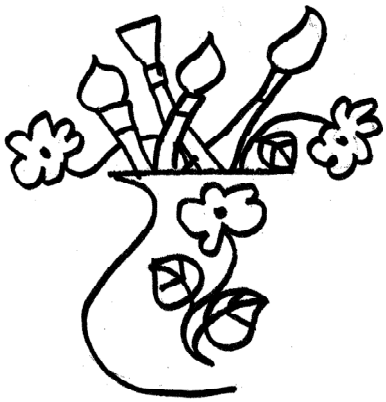

Everything has colour of its own,
We learn by seeing colours –
Colour has memories,
Colour helps us to travel –
It's the pantone colour system,
That makes us feel longing and warmth –
Sometimes it makes us shudder to in our core,
It expresses our emotions –
It shows affection and depth,
It is a mirror that shows the truth or,
Creates colourful mist.

A Friend Like You

Debanjan Bhowmick
Dept. of Commerce

When I met a friend like you,
My heart was full of joy;

The warmth of your love,
The genuineness of your concern,
Provided me the riches,
That money couldn't buy;

You nurtured the child in me,
And respected me as an individual,
You shared my happiness and felt my pain,
Even my thoughts, you understood so well.

With you everything appeared bright in hue,
When I met a friend like you,

But I don't know what happened to friendship of thee,
And I request you to come back to me.

He Who Thinks He Can, He Can

Pallabi Jana
Dept. of Commerce

If you think you are beaten, you are,
If you think you dare not, you don't
If you wish to win, but you think you can't
It is certain you won't !
If you think you'll lose you've lost.
For out in the world we find,
Success begins with a strong will
It's all in the state of mind !
Sooner or later one who wins life's battle
Is the man who thinks he can !

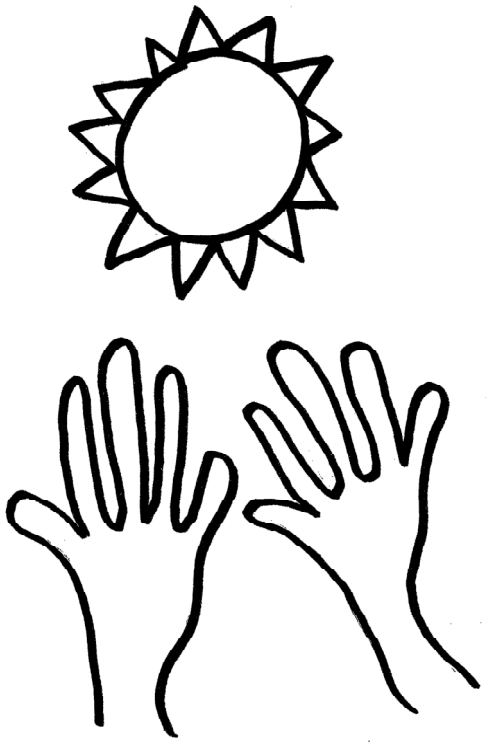

जब हम बड़े होंगे

मो॰ तोसीफ खान
राष्ट्रविज्ञान विभाग

हम जब होंगे बड़े, देखना
ऐसा नहीं रहेगा देश।

अब भी कुछ लोगों के दिल में
नफरत है ज्यादा, प्यार कम
हम जब होंगे बड़े, घृणा का
नाम मिटाकर लेंगे दम।

हिंसा के विषमय प्रवाह मे
कब तक और बहेगा देश?

भ्रष्टाचार, जमाखोरी की
आदत बड़ी पुरानी है,
ये कुरीतियाँ मिटाकर ही,
नई चेतना लानी है।

एक घरौंदे जैसा आखिर,
कितना और ढहेगा देश?

इसकी बागडोर हाथों में,
जरा हमारे आने दो,
थोड़ा सा बस पाँव हमारा
जमीन पर टिक जाने दो।

हम भारत का झंडा हिमगिरि से
ऊँचा फहरा देंगे,
रेगिस्तान, बंजरो तक मे
हरियाली लहरा देंगे।

অবসর সমাচার

এই যুগ্ম শিক্ষাবর্ষের সময়টি খুব ভালো কাটেনি আমাদের। বিশ্বব্যাপী অতিমারির দাপটে গৃহবন্দি আতঙ্কিত আর সন্ত্রস্ত সমস্ত মানবসভ্যতা। মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চলছে এক বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে — জানি না আমরা এই যান্ত্রিকতাই আমাদের ভবিতব্য কি না! তবু আশা জেগে থাকে ... জানি না সে আশা কুহক নাকি তা এক নতুন দিনের সূর্য? এই আবহেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের দুই শিক্ষক ও তিন শিক্ষাসহকর্মী অবসর নিলেন। অবসরগ্রহণ করলেন বাণিজ্য বিভাগের প্রাণচঞ্চল, ছাত্রদরদি শ্রী মুকুল ভট্টাচার্য আর সংস্কৃত বিভাগের সদাপ্রসন্নময়ী ড. কাজল দে।

মহাবিদ্যালয়ের অফিস আরো ফাঁকা হল আমাদের বহুদিনের সঙ্গী শ্রী সমীর হালদার, শ্রী রঞ্জন হাজারি এবং সকলের প্রিয় অ্যাকাউন্টেন্ট জ্যোতির্ময় মিশ্র-র অবসরগ্রহণে। সমীরদা আর রঞ্জনদা ছিলেন নীরব কর্মী। চুপচাপ শান্ত মনে সম্পন্ন করতেন তাঁদের কাজ আর জ্যোতির্ময়দা ছিলেন হাসিখুশি উৎসাহী মানুষ। কলেজ এই পুরোনো মানুষগুলিকে মনে রাখবে তার স্মৃতির ইতিহাসে। সকলের অবসরকালীন জীবন সুন্দর হোক। এইটুকুই প্রার্থনা!

প্রবন্ধ নিবন্ধ

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিক

প্রভাস মণ্ডল
প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

আমাদের প্রিয় সংস্কৃত বিভাগের তরুণ গবেষক অধ্যাপক প্রভাস মণ্ডল গত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ অকালপ্রয়াত। তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে অমলিন। তাঁকে মনে রেখে তাঁর একটি লেখা বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

— সম্পাদকমণ্ডলী

বর্তমান নিবন্ধে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দিকটি বিশ্লেষণ না করে সেই যুগের শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরা হল — যা বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সবক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক দিকই বর্তমান সমাজে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি বহুদিকই এখনও অনুসরণীয়। শিক্ষা ব্যবস্থার এমনই কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

প্রথমেই আসা যাক শিক্ষণীয় বিষয়ে। বেদ ছিল বৈদিক ও বেদ পরবর্তী যুগের প্রধান পাঠ্য বিষয়। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব — এই চার বেদের অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত পবিত্র কর্ম। চার বেদের সাথে ষট্ বেদাঙ্গ, যথা — শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ - অধ্যয়ন করা হত। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে অনেকেই প্রায় অভিযোগের সুরে একটা কথা বলে থাকেন; ভারতীয় শিক্ষা হল আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা। এখানে বাহ্য বিষয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একথাটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় দিক এবং একমাত্র ভারতীয়দের থেকেই প্রথম আমরা এই শিক্ষা পেয়ে থাকি — একথা সত্য হলেও ভারতীয়রা বাহ্য বিষয়ের শিক্ষা দেয় না — এটা বিশ্বাস করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করতে পারি। ধর্মশাস্ত্র, যাকে 'Ancient Indian Law Book' বলা হয়ে থাকে। বিচার ব্যবস্থায় এই শাস্ত্রের যে কি বিশাল ভূমিকা, তা যাঁরা এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন। ব্রিটিশরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর তারা নিজেদের রীতিনীতির প্রয়োগ করতে থাকেন, কিন্তু বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁরা এই শাস্ত্রের গুরুত্ব নতমস্তকে স্বীকার করেন। তাইতো সরকারী খরচায়

এদেশীয় পণ্ডিতদের দিয়ে এই শাস্ত্রের নতুনভাবে সংকলন করেন এবং প্রচুর ব্যয়ে ইংরাজীতে তার অনুবাদ করেন। শুধু বিচার ব্যবস্থাই নয়, সামাজিক আচার ব্যবস্থাতেও এক বিস্তৃত আলোচনা আমরা এই শাস্ত্র থেকে পেয়ে থাকি। এর সাথে সাথে অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা প্রভৃতি ছিল অধ্যয়নের বিষয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আমরা চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ পাই। এগুলি হল — চারটি বেদ, ছয়টি বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র। বিষ্ণুপুরাণে এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার সাথে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র — এই চারটি উপবেদ নিয়ে মোট আঠারোটি বিদ্যার উল্লেখ আমরা পাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বিক্ষীকি, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি — এই চারবিদ্যার উল্লেখ আমরা পাই। 'বার্তা' বলতে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়াও বহুবিধ লৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি। তবে একথা উল্লেখ্য বেদকে সর্বদাই বিদ্যার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়ন বলতে শুধুমাত্র মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা নয়, যথাযথভাবে তার অর্থ বোধের উপর জোর দেওয়া হত। এ প্রসঙ্গে নিরুক্তকার যাস্কের অভিমত — যে ব্যক্তি অর্থ না বুঝে অধ্যয়ন করেন, তিনি বৃক্ষ এবং জড়ের সমান; কিন্তু যিনি অর্থ বুঝে অধ্যয়ন করেন, তিনি অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তিও ঘটে। বিষয়টি বর্তমান শিক্ষায় খুবই প্রাসঙ্গিক। বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে কয়েকটি নোটের উপর ভিত্তি করে পড়াশোনা - বর্তমান শিক্ষার যেন প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা শুরু হত উপনয়নরূপ সংস্কারের দ্বারা। দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ এখানে আচার্য অর্থাৎ যাঁর থেকে এই সংস্কারটি নেওয়া হত, তিনি হতেন পিতা এবং মাতা হতেন সাবিত্রী মন্ত্র, কারণ উপনয়নরূপ সংস্কারে এই মন্ত্রের জপ করতে হত। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুকূলভিত্তিক অর্থাৎ গুরুগৃহে থেকেই শিক্ষা অর্জন করতে হত। যদিও মহাভারতে, বানের কাদম্বরীতে আমরা গুরুকে গৃহে এনে শিক্ষা দেওয়ার উল্লেখও পাই।

উপনয়নরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার পর থেকে শুরু হত অধ্যয়নের কাজ। তবে গুরুগৃহে শুধু অধ্যয়নই নয়, তাদের বেশ কিছু কাজ করতে হত; সেগুলি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য করত। গুরুর প্রতি পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন, তাঁর জন্য সমিধ আহরণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহের দ্বারা জীবন ধারণ, সর্বদা সত্য কথা বলা, মধু-মাংস পরিত্যাগ করা, প্রেম-মোহ-বিরহ-নাচ-গান-বাজনা থেকে দূরে থাকা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুচিতা বজায় রাখা — এগুলি ছিল তাদের নিত্য পালনীয় বিষয়। শুধু অধীত বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে এক দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠার উপযুক্ত শিক্ষা - তারা গুরুগৃহ থেকে লাভ করত।

অধ্যয়ন যেমন ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্তব্য, অধ্যয়ন করানোও তেমনি গুরুর দায়িত্ব। প্রশ্নোপনিষদে (৬.১) বলা হয়েছে — যে গুরু নিজের অর্জিত বিদ্যা শিষ্যকে দান করেন না, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার শুকিয়ে যায়। মহাভারতের দ্রোণপর্বে (৫০.২১) শিষ্যকে কোটি পুত্রের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে — যদি কোন আচার্য তাঁর গৃহে এক বৎসর অবস্থানকারী শিষ্যকে অধ্যয়ন না করান, তাহলে শিষ্যের সমস্ত পাপ গুরুতে সংক্রমিত হয় এবং শাস্ত্রে এমন গুরুকে সর্বদাই ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানে ছাত্রের সাথে সাথে গুরুর দায়িত্বও স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - অধ্যয়নের জন্য কোন নির্দিষ্ট শুল্ক নির্ধারিত ছিল না। আগস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে - অধ্যয়ন সমাপনান্তে শিষ্যের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী

গুরুকে কিছু দিয়ে যাওয়া উচিৎ। শাস্ত্রকার মনু (২.২৪৫-২৪৬) উল্লেখ করেছেন — শিক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার আগে শিষ্য গুরুকে কিছু দেবে না। তবে গৃহে ফেরার সময় শিষ্য তার সাধ্যমত ভূমি, সোনা, গরু, অশ্ব, জুতা, ছাতা, আসন, অন্ন, বস্ত্র বা শাক-সব্জী গুরুকে দিতে পারেন। গুরুকে যাই দেওয়া হোক না কেন, সেগুলি কেবলমাত্র তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য। বাস্তবক্ষেত্রে শিষ্য গুরুর থেকে যে জ্ঞানরাশি গ্রহণ করে তা পিতৃঋণের মতই অপরিশোধ্য। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে (৫৫.২৯) বলা হয়েছে — শিষ্যের বাক্য ব্যবহারের দ্বারা যে প্রসন্নতা গুরু লাভ করেন, তাই হল প্রকৃত গুরুদক্ষিণা।

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে — যাঁরা জীবিকার জন্য বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করান, তাঁরা হলেন উপাধ্যায়। অর্থের বিনিময়ে যাঁরা ছাত্রদের পড়ান, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদেরকে উপপাতকের মধ্যে গণনা করেছেন। কিন্তু মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য প্রমুখের মতে শিষ্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করলে কেউ ভর্ৎসনার পাত্র হন না, তবে তিনি যদি নির্দিষ্ট একটা বেতন গ্রহণ করেন - তাহলেই তিনি ভর্ৎসনার পাত্র হয়ে ওঠেন। যদিও মনুস্মৃতিতে (১০.১৬) আপদকালে জীবিকা নির্বাহের জন্য এই ব্যবস্থা সমর্থন করা হয়েছে। গৌতম, বিষ্ণু, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ শাস্ত্রকারদের মতে বিদ্বান ব্যক্তি যাতে অন্ন-তৃষ্ণায় কষ্ট না পান - তা দেখার দায়িত্ব রাজার। রাষ্ট্রের দ্বারা রক্ষিত হয়েও যাঁরা বিদ্যার্থীদের থেকে অর্থগ্রহণ করেন, সম্ভবতঃ তাঁদের প্রতিই এই বিদ্বেষ বাক্য।

এর সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে রাষ্ট্রের তরফ থেকে সেই অসুবিধা দূর করা হত। কালিদাসের রঘুবংশে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার অর্থ রঘুরাজার থেকে উল্লেখ আমরা পাই। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকেও আমরা পাই — মগধরাজ কন্যা পদ্মাবতী যখন তপোবনে আসেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য কারোও যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি তা চাইতে পারেন। এই বিষয়টি বর্তমান যুগের বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তির কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

বিদ্যার্থীদের শাস্তি দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার কথাও আমরা শাস্ত্রে পেয়ে থাকি। শাস্ত্রকার গৌতম (২.৪৮-৫০) বলেছেন — সাধারণভাবে মধুর বাক্য প্রয়োগ করেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। তবে শব্দের প্রভাব যদি তাদের উপর না পড়ে তাহলেই গুরু দড়ি বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তাদেরকে আঘাত করতে পারেন। অন্য কিছু দিয়ে শিষ্যকে আঘাত করলে গুরুকে রাজদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ আমরা পাই। বিষ্ণুধর্মসূত্র, নারদস্মৃতি গৌতমের বচন অনুসরণ করে বলেন - কেবল পিঠেই এগুলি দিয়ে গুরু শিষ্যকে আঘাত করতে পারেন। মাথা, বুকের ছাতি বা অন্য কোনও স্থানে নয়। যদি এমন ঘটে তাহলে শাস্ত্রে শিক্ষককে চোরের দণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই স্বল্প পরিসরে উল্লিখিত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ণ যদি আমরা করি, তাহলে এর বিশেষ বিশেষ যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সামনে উঠে আসে, সেগুলি হল —

১) গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের। শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও গুরু শিষ্যের ব্যক্তিগত দিকে খেয়াল রাখতেন।

২) শিষ্যকে গুরুকূলের সদস্য মানা হত।

৩) গুরুকে সর্বদাই উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে।

৪) অনুশাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর।

৫) রাষ্ট্রের তরফ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটা বড় দায়িত্ব নেওয়া হত।

৬) শিক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট শুল্ক নির্ধারিত ছিল না।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

‘‘ত্যজ প্রেয় — ভজ শ্রেয় নিত্য সুখ-লভিবারে।’’

— স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

ড. সুকুমার দেব
কলেজের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্মাননীয় সদস্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর তাবড় তাবড় জ্ঞানী-মনীষী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিকের অঙ্গনে - স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গমাতার কোলে অনন্য সন্তান গুরুদাস ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেন। দীর্ঘ ৭৫ বৎসর জীবন সীমানায় দুঃখ-দারিদ্র্যের পাথার পেরিয়ে আশা-নিরাশা দ্বন্দ্ব অভিঘাতের মধ্য দিয়ে পিতৃহারা তিন বছরের সন্তান মায়ের আদরযত্নে কাঠোর কঠিন শাসনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে শিক্ষা অঙ্গনে এবং কর্ম জগতে দাগ কেটে গেছেন — তা চির স্মরণীয়। তাঁর জীবন চরিতের শিক্ষা-দীক্ষা নিঃসন্দেহে ধ্রুব নক্ষত্রের মতো দেশবাসীর সামনে দেদীপ্যমান থাকবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবারের নিকটে বেরোগ্রামে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্ব-পুরুষদের জন্মভূমি। ঠাকুর্দা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন যুগে ইংরেজী শিখে বিদেশী কোম্পানীতে যোগ দেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোলকাতাতেই এক কোম্পানীতে কাজ নেন। পরবর্তীকালে পিতামহের কেনা নারকেলডাঙ্গায় এক খণ্ড জমির উপরেই স্থায়ী বসতবাটী নির্মিত। ১৮৪৪ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী গুরুদাসের জন্ম। তাঁর ৩ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃহারা সন্তানকে বুকে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে গুণবতী, ধর্মপরায়ণা, সাধ্বীমাতা সোনামণি দেবীর সংগ্রাম শুরু। পুত্রকে মানুষের মতো মানুষ করবার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্প। তৎকালীন যুগে মহিয়সী এই নারী সন্তানকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু করার প্রেরণা দান করলেও জাতীয় জীবনের অতীত ঐতিহ্যকে সার্বিক অটুট রেখে পরম আদরে ও চরম শাসনে সন্তানকে পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জন করেন। সোনামণি দেবীর আরাধ্য কর্মধারায় বারবার ভগবতী দেবীর জীবনচিত্র উদ্ভাসিত। ঘরে মায়ের কাছেই গুরুদাসের শিক্ষা আরম্ভ।

অবৈতনিক জেনারেল এসেম্বলী বিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হয়ে অসুস্থতার জন্য মামা তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি করেন। সেখান থেকে হেয়ার স্কুলে। এই বিদ্যালয়ে আসার পর থেকেই গুরুদাসের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। প্যারীচাঁদ সরকারের মতো বিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষকের স্নেহধন্য গুরুদাস অসুস্থ অবস্থাতেও হেয়ার স্কুলে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। সেখানে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাউয়েল, স্যাট্‌ক্লিফ্, সাউন্ডার্স, লব, জোন্স, স্টিফেন্সন, রিস, প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ সুধীজনের কাছে পাঠ নেন। একের পর এক এম.এ (অঙ্ক) এবং আইন পরীক্ষা পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে গলায় কতই না সোনার মেডেল পরেন।

একমাত্র পূর্ব নির্ধারিত নাম স্থিরীকৃত থাকায় প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

বর্তমান খেইহারা, দিক্‌ভ্রান্ত, পঠন-পাঠনে অনীহা কেন্দ্রিক ছাত্র সমাজের কাছে গুরুদাসের ছাত্র জীবনের ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহে প্রেরণা জোগাবে।

গণিত শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন প্রেসিডেন্সী ও স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করে — বহরমপুর কলেজে ও আদালতে পারম্পর্য রক্ষা করে কাজ করার সুবাদে বহরমপুরে চলে যান। এখানে দুই কর্মক্ষেত্রেই সুনাম অর্জন করেন। সেখানে ওকালতী আরম্ভের পূর্বেই তিনি উর্দুভাষা শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর যে অকুণ্ঠ আকর্ষণ ছিল তার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের হাতে।

মহাকবি কালিদাসের কাব্য বিশেষ করে নাটকাদি অধ্যয়নের পাশাপাশি 'দায়ভাগ' ও অধ্যয়ন করেন। পিতামাতার কোলে বসে গীতাপাঠ শুনে যিনি তন্ময় হতেন — জীবনের শেষ লগ্নে সেই গীতা পাঠ শুনেই তিনি চিরনিদ্রায় যান। তাঁর সরলতা, অমায়িকতা, বিনয়, নম্রতা, সত্যবাদীতা, নৈতিক চেতনা, আপন স্বাতন্ত্র্য, আপন ধর্ম — এ সবেরই মর্মমূলে রয়েছে ঔপনিষদিক শিক্ষায় শিক্ষিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্য। নিগূঢ় ধর্মানুরাগ থেকে তাঁর বিন্দুমাত্র কক্ষচ্যুতি কখনই ঘটেনি। সকল ধর্মের প্রতি সমন্বয়ী ভাবনা থাকলেও শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠায় তিনি অবিচল ছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত গুরুদাস বিশেষ দক্ষতা ও গুরুত্বের সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। হাইকোর্টের দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবহারজীবিরা তাঁর দীর্ঘ ষোল বছরের যুক্তি তত্ত্ব তথ্যপূর্ণ পক্ষপাত শূণ্য যথাযথ বিচারাদিকে শতমুখে প্রশংসা করেছেন। কর্মযজ্ঞে তাঁর একনিষ্ঠতা তুলনাহীন। মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে বাড়িতে রেখেও তিনি হাইকোর্টে দায়িত্ব পালনে হাজির হতে দ্বিধা করেননি। এমন একনিষ্ঠ কর্মী হাতে গোনা যায়। হাইকোর্ট থেকে বিদায়লগ্নে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র এবং এডভোকেট জেনারেল মিঃ জে.টি. উড্‌র ব্যারিস্টারদের পক্ষ থেকে বক্তব্য তাঁর সীমাহীন গুণে বার্তার জীবন্ত দলিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু কৃতি ছাত্র নন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৮ খ্রীঃ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে নিযুক্ত হন এবং পরের বছরই বি.এল পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং ঐ বৎসরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ থেকে দীর্ঘ ৪০ বছর — তিনি প্রাণ-মন ঢেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সভ্য হিসাবেও তাঁর অবদান - সীমাহীন। ১৮৯০ সালে তিনি ভারতবাসী হিসাবে সর্ব প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। তাঁর এই গৌরবজনক পদপ্রাপ্তি সম্পর্কে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কনভোকেশনের বক্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি বলেন —

"..... I desired to offer my congratulations to the newly appointed vice-chancellor of the accession to the honourable office. He enters upon it with the goodwill of his fellow citizens of the university and of the Government of India. I do not believe that any more suitable selection could have been made."

ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা স্মরণীয়, শুধু স্ত্রী শিক্ষা নয় - তাদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচনে, কৃষিশিক্ষা - ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রগাঢ় বিস্তারের জন্য ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পদক্ষেপে তাঁর মতামত বলিষ্ঠ দৃপ্ত ছিল। যার ফলে পরবর্তিকালে

এর সার্থক ফলাফল আমরা হাতে নাতে পাই। একনিষ্ঠ হিন্দুধর্মের ধারক বাহক হয়েও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনন-চিন্তনের প্রতিভূ স্যার গুরুদাস স্পষ্টভাবে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে মত ব্যক্ত করতেন —

''যত্র নার্য্যস্তু পূজান্তে তত্র দেবতা।''
তত্রইবাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।''

অর্থাৎ যেখানেই স্ত্রীজাতি সম্মানিত হন, সেখানেই দেবতাগণ - বিরাজ করেন। যেখানে স্ত্রী জাতি সম্মানিত না হন, সেখানে সকল অনুষ্ঠানই নিষ্ফল হয়। তিনি সিনেট সভায় - যৌবন উদ্ধিন্ন সুরে বলতেন — ''বাণিজ্য শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা না দিলে এই জাতির আর উন্নতির উপায় নেই। এক্ষণে আমরা শ্রমশিল্পের মর্যাদা বুঝিতে পারিতেছি, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন শিল্প ও কৃষিশিক্ষা দিতেই হইবে।'' তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার পথ ধরেই পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় করে গেছেন — এর সঙ্গে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা দানের ব্যাপারটিও যুক্ত। তিনি আজীবন দরিদ্র বন্ধু ছিলেন। ১৯১৭ সালে সিনেট সভায় প্রবেশিকা ও আই.এ পরীক্ষার ফী বাড়াবার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বজ্র নির্ঘোষে তিনি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দরিদ্র ছাত্রদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অনেকটা দরজা খুলে দেন। অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারবে না — একথা কোনদিনই তিনি মেনে নিতে পারেননি। আজও কথাটি শিক্ষাজগতে মনে রাখা দরকার ''চির অনাদৃতা, চির লাঞ্ছিতা, চির দুঃখিনী বঙ্গভাষা আজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে আদৃতা ও সম্মানিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এই সমাদর যাঁহাদের চেষ্টায় হইয়াছে স্যার আশুতোষের ন্যায় স্যার গুরুদাসও তাঁহাদের অন্যতম।'' (বংশ পরিচয়, ত্রয়োদশ খণ্ড - শ্রী জ্ঞনেন্দ্রনাথ কুমার - সঙ্কলিত পৃঃ ১৬৯)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া স্যার গুরুদাস বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর যুক্তি তথ্যপূর্ণ উপদেশে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ও নানা দিক থেকে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ''দাতাকর্ণে''র মতই বোধ-বুদ্ধি ও অর্থের দিক থেকে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন প্রাণ-মন ঢেলে। তাঁর হৃদয় দ্বার থেকে কেউই বিফল হয়ে ফিরে আসেননি। ১৯০৪ খ্রীঃ ভারত সরকার 'স্যার' উপাধি প্রদান করে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন।

অকপট হিন্দুত্বের দাড়ি-কমা জীবনে থাকলেও বিধবা-বিবাহের সমর্থন না করলেও তিনি শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তা চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। শ্রীমধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য নিয়ে যখন ঝড় তুলেছে কট্টর প্রাচীনপন্থীর দল — 'সিদ্ধরস ব্যতিক্রম হয়েছে', 'ছুছুন্দর বধ' কাব্য লিখে কবিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র হয়েও গুরুদাস এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অমিত্রাক্ষরছন্দ, শব্দবিন্যাস কবিত্বের ঝঙ্কারের মুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, উর্দু, বাংলা ভাষার গ্রন্থাদি তিনি আমৃত্যু পাঠ করেছেন। নানা গ্রন্থ প্রবন্ধাদির মধ্যে তাঁর সৃষ্টির ঐশ্বর্য প্রতিভাত।

(ক) 'Hindu Law of Marriage and Stridhan' আইন অধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের সমাদৃত।

(খ) "A few thoughts of education in India" (শিক্ষা-সংক্রান্ত কয়েকটি জটিল সমস্যার সমাধান)

(গ) 'জ্ঞান ও কর্ম' আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক।

(ঘ) 'সামবেদ' — মাতৃশ্রাদ্ধের সময় বিতরিত পুস্তক - বাংলা অক্ষরে অনুদিত।

মৌলিক প্রবন্ধ দ্বয় —

(ক) Necessity of religious ceremonies in adoption"

(খ) 'Hindu Law of endowments' — এই দুটি প্রবন্ধ আইএনর অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য লিখিত।

(গ) The educational problem of India

A note on the devanagri Alphabet for Bengali student ইত্যাদি এসব ছাড়া সহজ-সরল প্রণালী ও প্রক্রিয়া এবং নিয়মের দ্বারা তিনি ইংরেজী ও বাংলায় পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি বিষয়ে বহু বই লিখেছেন। অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের হৃদয় জয় করেন। তিনি যেমন অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনি এই সব বই পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-সমাজ ও তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতেন। প্রতিটি পুস্তকই পরম সমাদর লাভ করেছিল। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত কবিতা ও গানও হৃদয় জয়ী। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর রচিত গান গীত হতো।

দৃষ্টান্ত ঃ—

''কৃতার্থ ভারতবাসী' - তব শুভ আগমনে'' — সিন্দু-তেওরা ছন্দে ভারত সম্রাটের আগমনে রচিত গানটি।

''বাল্মীকি প্রতিভা''য় তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য লিখেছিলেন —

''উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তবে সুপ্রভাত হলো হের।
উটেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পূনর্ব্বার।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ সভায় রচিত গান —

''ভুলনা আনন্দময়ে আজি আনন্দ দিনে
সুখে স্থৈর্য্যে দুঃখে ধৈর্য্যে কে দিবে আর তিনি বিনে।
সুখ দুঃখ সম হেরি, ঈর্ষাদ্বেষ পরিহরি
লোকহিতে রত হও, যথাশক্তি যথাজ্ঞানে।।''

এছাড়া বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠান, হেয়ার, হিন্দু স্কুল, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা অবিস্মরণীয়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের যে কোন নাটক ও আবৃত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনিই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন।

গুণগ্রাহিতা ও স্পষ্টবাদীতা - তাঁর চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত। স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৭ সালে বৌবাজারে প্রতিষ্ঠিত 'Indian Association for the Cultivation of Science' হলে শুচি-শুভ্র ধুতি-চাদর পরিহিত রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত অধ্যাপক দেশপ্রেমিক ও ছাত্রমন্ডলীর সামনে প্রথম বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধের বিষয় বস্তু 'সৌন্দর্যবোধ' — মধুকণ্ঠের প্রবন্ধ পাঠ শুনে চার দিক নিবাত-নিস্পন্দ। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে - প্রবন্ধ সম্পর্কে কোন কিছু সমালোচনা বা বলার থাকলে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলতে অনুরোধ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. পি.কে. রায় দাঁড়িয়ে বলেন যে সভায় উপস্থিত সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ - একজন বাদে। তাঁদের জিজ্ঞাসার কিছু নেই। তারপরই ধীরস্থিরভাবে উঠে - গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেন যে এই প্রবন্ধের বলার ব্যাপারে তাঁর কোন পূর্ব্ব প্রস্তুতি নেই। যা শুনেছেন - তা শুধু শুনে কিছু বলার নেই - তিনি কবিকে প্রবন্ধটি ছাপাতে বলেন - যা একবার দুবার পাঠ করে তারপর তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করবেন। এখানেই থামেননি — তিনি দৃঢ় কণ্ঠে কবিকে প্রবন্ধটি ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদ করে প্রকাশ করতেও বলেন — যা পাঠ করে ইংরেজরা বুঝতে পারবেন 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এর কথা এবং কবির লেখায় আকৃষ্ট হয়ে তারা কবিগুরুর সৃষ্টি সমূহ পাঠের জন্যই বাংলা ভাষা শিখবার জন্য অগ্রসর হবে। স্যার গুরুদাসের রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে — "Song offering" কে কেন্দ্র করে কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে। গুরুদাসের এই দূরদৃষ্টির পরিচয় আমরা বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। কলকাতার বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। অবসরকালে দিনরাত দেশ ও সমাজের সেবায় মগ্ন। তাঁর আজীবন ছিলেন লোক কল্যাণবোধ। ছোট-বড় যেকোন অনুষ্ঠানের ডাকেরই তিনি সানন্দে সাড়া দিতেন। বালকদের সভায় হাস্যরসের সভায় হাস্যরসের উতোরলে চারদিক মূখর করতেন তাদের জীবনে সরসতা বাড়াতেন, দূরন্ত-অশান্ত, পচণ্ড-প্রমত্ত যৌবনের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পেতে - তাদের সদুপদেশ দান করে - কর্মযজ্ঞে উৎসাহিত করতেন এবং - বয়োবৃদ্ধদের সভায় সুচিন্তির ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে আলোচনার গাম্ভীর্য ও যুক্তি-বুদ্ধির খোরাক যোগাতেন। এক কথায় সহজ-সরল কমনীয় গুণের সঙ্গে তেজস্বিতার সমন্বয় ঘটিয়ে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কথা বলতেন। বক্তৃতায় তিনি প্রতিটি কথা যেন মেপে জুপে বলতেন। তাঁর কথায় ও কাজে চিন্তায় ও সৃষ্টিতে ছিল গভীর সংযম। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রদের সংযম ও শিষ্টাচারের কথা বারবার বলতেন। একদিন অনুমতি ছাড়া কয়েকজন ছাত্র ক্লাস থেকে চুপে চুপে বেরিয়ে যায় — পরে তারা ক্লাসে এলে তাদেরকে তিনি বলেন — ''তোমরা আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেই বাইরে যাইতে পারিতে, যখন দরজা খোলা, তখন প্রাচীর লঙঘনের ক্লেশ স্বীকার করিবার কি কোন আবশ্যকতা ছিল'' স্বার্থপরতা, ভোগস্পৃহা, অসংযম, নিম্ন স্তরের বইপত্তর পাঠ, বেশভূষা ও দৈনিক বিনোদনের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ, পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদিকে ছাত্রদের সরলতা ও পবিত্রতার বিনষ্টির কারণ বলে মনে করতেন।

কর্তব্যবোধে অপ্রিয় সত্যকথা বলতে তিনি বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। লর্ড কার্জন এক সভায় ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর নিন্দা করলে তার তীব্র প্রতিবাদ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের একের পর এক অসামান্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কার্জনকে ধরাশায়ী করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনেও শুধু 'হ্যাঁ' করে সব ব্যাপারে গা ঢেলে দেননি — তিনি অসংকোচে নিজের মত যুক্তিসহ পেশ করতেন — সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে সে মত খারিজ হলে তিনি নির্দ্ধিতায় সেই সভার গৃহিত প্রস্তাবে 'Note of Decent' দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এক কথায় কত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির কাছে আত্মমর্যাদা কখনই বিসর্জন দেননি। তিনি আত্মপ্রচারক ছিলেন না। অগণিত পিছিয়ে পড়া মানুষ, শতশত দরিদ্র বিদ্যার্থী গুরুদাসের কাছে অর্থ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু তাঁর আড়ম্বর শূণ্য এই বদান্যতাকে কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশে তিনি বিমুখ ছিলেন। জীবনে কারো কাছ থেকে ঋণ তিনি নেননি — আবার কাউকেও এক কর্পদকও ঋণ দেননি। এটি ছিল তার অচল-অটল জীবনাদর্শ।

স্বদেশ প্রেম ও স্বজাত্যবোধ ছিল গুরুদাসের কর্ম প্রেরণার মূল উৎস। মানব ধর্মে দীক্ষিত এই মহাপুরুষ দেশবাসীকে যথার্থ মানুষ রূপে তুলে ধরার জন্য আজীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁর এই দৃঢ় সংকল্পে — "As one lamp lights another nor grows les so nobleness in kindleth nobelness." কবিতাংশটির কথা বারবার মনে জাগে।

জীবনের শেষ প্রান্তে জর্জ হাই স্কুল অর্থাৎ নারকেলডাঙ্গা ইংরেজী হাই স্কুলে ও সি.টি কলেজে আইন বিভাগে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে — পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাদান করে আমৃত্যু এই প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ পরমতৃপ্ত হয়েছেন এবং ছাত্র সমাজকেও তৃপ্তি দান করেছেন। আলোচ্য শিক্ষায়তনদ্বয়ে শিক্ষাদানের জন্য এক কর্পদকও তিনি শ্রমের মূল্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্যার গুরুদাসের জীবন সর্বকর্মে এই নৈতিক চেতনা নিঃসন্দেহে দেশবাসীর এগিয়ে চলার পাথেয়।

পারিবারিক জীবনেও সন্তানের প্রতি অপার স্নেহ এবং মাতার প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করছে হেয়ার স্কুলে 'যতীন্দ্র চন্দ্র পদক' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সোনামণি' পুরস্কার। চারটি পুত্ররত্ন, দুই কন্যা ও পত্নীকে রেখে পরম শ্রদ্ধেয় মাতার জন্য নির্মিত গঙ্গা তীরবর্তী গৃহে ১৮১৮ সালে ২রা ডিসেম্বর রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ভারত গগণের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি কক্ষচ্যুত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে মার্বেল পাথরে নির্মিত স্যার গুরুদাসের মূর্তির নীচে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক বার্তাটি বিশ্ববাসীর জ্ঞাতার্থে ইংরেজীতে "With care, keep your body pure, and your mind pure : give up that which is merely pleasing, follow that which is abidingly good, to attain to the Eternal Bliss." (Sir Gooroodas Centenary Commemorations volume - page 133) রূপে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ — 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধে 'স্বদেশ-বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত' - 'ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ সকলের বিশ্বাসভাজন, আত্মশক্তিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্বকে অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করে সমাজের বুকে গুরুদাসকে মুক্তকণ্ঠে আসবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই — ''গুরুদাস তোমার এ সময়ে বাঁচিয়া থাকা উচিত ছিল, বাংলায় যে তোমার মত মানুষেরই একান্ত প্রয়োজন।'

Goorudas / Thou should be living at this hour, Bengal hathneed of thee." তথ্যাদি সংগ্রহ ভাণ্ডার —

ক) বংশ পরিচয় - ত্রয়োদশ খণ্ড - শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার সঙ্কলিত।

খ) Sir Gooroodas Centenary Commemoration volume Edited by Anathnath Basu, University of Calcutta 1948.

গ) Reminscences, speeches and writings of Gooroodas Banerjee – Upendra Chandra Bandopadhyay.

ঘ) আচার্য গুরুদাস — শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

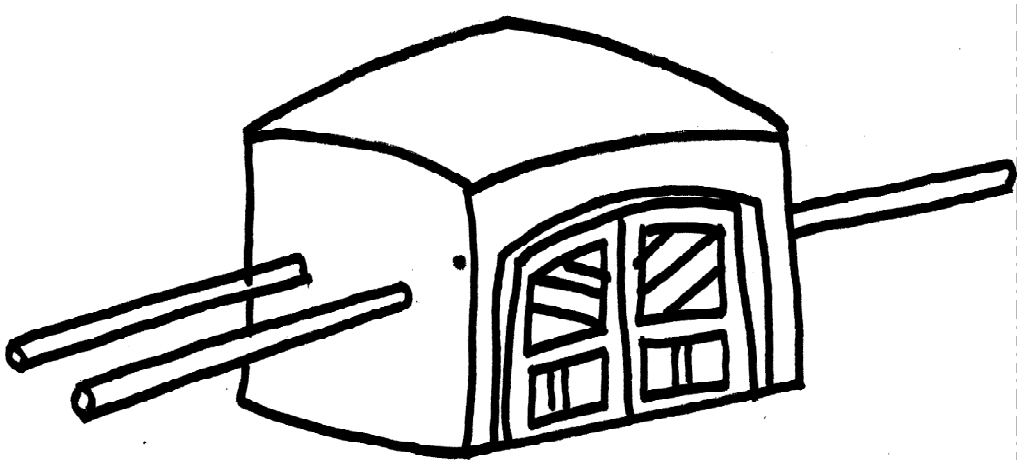

পালকির আড়ালে

সঞ্চিতা বসু
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

আঠারো শতকের বাংলা। বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির আগমন ঘটেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রসারিত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের প্রয়োজনও সেই মতো বাড়ছে ক্রমশ। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাবের পরাজয় কলকাতার পরিবেশে দ্রুত বদল ঘটাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক কেন্দ্র, এই সব কিছু মিলে কলকাতা তখন এক গতিময় শহর। কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (এই সময় সার্কুলার রোড তৈরি হয়) প্রকৃত কোনো বড় রাস্তা সেখানে ছিল না। সব রাস্তাই ছিল সরু আর কাঁচা। যাতায়াতের উপায় হিসাবে সে সময় চারটি বিকল্পের কথা জানা যায়। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি, হাতি বা উটের পিঠে, আর নয়তো পালকি। স্বভাবতই পালকির চাহিদাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

তবে পালকি ছিল বেশ ব্যয়বহুল। মর্যাদায়ও ও আরামদায়কও বটে। রাইটাররা যাতে পালকির পিছনে বেশি ব্যয় করতে না পারে সেজন্য ক্লাইভ শুধুমাত্র শীতকালে ও বর্ষাকালে তাদের পালকি চড়ার অনুমতি দেন। যদিও এই নিষেধ তারা খুব একটা মানত না। 'কলিকাতা দর্পণ' থেকে জানা যায়, ১৮৫০ সালে একজন হিন্দুস্থানি পালকি বাহকের মাইনে ছিল চার টাকা ও একজন উড়িয়ার পাঁচ টাকা। দূর-দূরান্তে যেতে পালকির ভাড়া পড়ত একালের উড়ো জাহাজের মতোই। বাসুদেব মোশেল 'পালকি থেকে পাতাল রেল' প্রবন্ধে বলেছেন, সে সময় পালকি চড়ে কলকাতা থেকে কাশী যেতে পড়তো পাঁচশো টাকা এবং পাটনা যেতে পড়তো চারশো টাকা।

সহজসাধ্য ব্যাপার, সামর্থের দিক থেকে পালকি ছিল মূলত অভিজাত শ্রেণির জন্য। তবে মানসিক দিক থেকে যারা নিজেদের মর্যাদাবান ভাবতে অথবা ভাবাতে পছন্দ করতো অথচ পালকির বিলাসিতা আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তারাও অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পালকি নিশ্চিত ভাবেই ব্যবহার করত। বিশেষ করে সে সময়কার কলকাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই যেখানে ছিল দেখানেপনা।

পালকির এই মর্যাদামণ্ডিত রূপের কারণেই মেয়েদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে তার বিশেষ ব্যবহার ছিল। অবশ্য অবরোধবাসিনী মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে পালকিতে চড়ে বসা সুবিধাজনকও। এই কারণে ঘোড়ার গাড়ি প্রচলনের পরেও বহুদিন পর্যন্ত মেয়েরা প্রধানত পালকি চড়েই যাতায়াত করতো। বেশ 'আধুনিক মনস্ক' পরিবারেও সে সময় এই চিত্রই দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, ''বেথুন স্কুল যখন প্রথম খোলা হল, আমার বড়দিদির ছিল অল্প বয়স। ধব্‌ধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ পরা তাঁকে চুরি করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিশে একবার ধরেছিল।''

মুসলমান সমাজে মহিলাদের অবরোধে রাখার বন্দোবস্ত-র যথাযথ চিত্র বোঝা যায় বেগম রোকেয়ার উল্লেখ করা কিছু ঘটনা থেকে : 'ইহাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাটনায় এক বড়লোকের বাড়ীতে শুভ বিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিত মহিলা আসিয়াছেন। অনেকে সন্ধ্যার সময়ও আসিয়াছেন। তন্মধ্যে হাশমত বেগম একজন। দাসী আসিয়া প্রত্যেক পালকির দ্বার খুলিয়া বেগম সাহেবাদের হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া যাইতেছে, পরে বেহারাগণ খালি পালকি সরাইয়া লইতেছে এবং অপর নিমন্ত্রিত পালকি আসিতেছে। বেহারা ডাকিল — ''মামা! সওয়ারী আয়া'' মামারা মন্থর গমনে আসিতেছে। মামা যতক্ষণে হাশমত বেগমের পালকির নিকট আসিবে ততক্ষণে বেহারাগণ ''সওয়ারী'' নামিয়াছে, ভাবিয়া পালকি লইয়া সরিয়া পড়িল। অতঃপর আর একটা পালকি আসিলে মামারা পালকির দ্বার খুলিয়া যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাকে লইয়া গেল।

শীতকাল। যত পালকি আসিয়াছে ''সওয়ারী'' নামিলে পর সব খালি পালকি এক প্রান্তে বটগাছের তলায় জড় করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূরে বেহারাগণ ঘটা করিয়া রান্না করিতেছে। তাহারা বিবাহবাড়ী হইতে জমকালো সিধা পাইয়াছে। রাত্রিকালে আর সওয়ারী খাটিতে হইবে না। সুতরাং তাহাদের ভারী স্ফূর্তি — কেহ গান গায়, কেহ তামাক টানে, কেহ খৈনি খায় — এইরূপে আমোদ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

এদিকে মহিলামহলে নিমন্ত্রিতাগণ খাইতে বসিলে দেখা গেল হাশমত বেগম তাহার ছয় মাসের শিশুপুত্র সহ অনুপস্থিত। কেহ বলিল, তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে ইত্যাদি।

পরদিন সকালবেলা যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাগণ বিদায় লইতে লাগিলেন — একে একে খালি পালকি আসিয়া নিজ নিজ ''সওয়ারী'' লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি 'খালি' পালকি আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার দ্বার খুলিয়া দেখা গেল হাশমত বেগম শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। পৌষ মাসের দীর্ঘ রজনী তিনি ঐ ভাবে পালকিতে বসিয়া কাটাইয়াছেন।

তিনি পালকি হইতে নামিবার পূর্বেই বেহারাগণ পালকি ফিরাইয়া লইয়া গেল — কিন্তু তিনি টুঁ শব্দ করেন নাই — পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারা শুনিতে পায়। শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই। যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পালকির দ্বার খুলিয়া দেখে! কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধ বাসিনীর বাহাদুরী কি?" গল্পটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মুসলমান মহিলাদের এই দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ বজায় রাখতে গেলে তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে আবদ্ধ পালকিই হবে একমাত্র ভরসা।

সে সময়কার সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলাদের দশাও এর চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল বলা যায় না। ঘরের ভিতর পর্দা যা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা মেয়েদের বাইরে বেরোবার ব্যবস্থাও ছিল একই রকম।

রবীন্দ্রনাথের কথায় যেমন রয়েছে ঃ ''মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজা বন্ধ পালকির হাঁপ ধরানো অন্ধকারে। গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও; বড়ো মানুষের ঝি বউয়ের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকতো মোটা কটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল কুটুম বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।''

উনিশ শতকের শেষ দিকে বা বিশ শতকের গোড়ার দিকেও মেয়েদের এই অবস্থার যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি, তা জানা যায় রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকেও। তিনি লিখেছেন : 'সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পালকি থেকে বেরিয়ে স্নান করতেন না।' তাঁদের ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি সুদ্ধ গঙ্গার জলে চোবানো হত। এদৃশ্য তিনি তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন।

যাইহোক, পালকির মর্যাদা সেসময় তাকে বিয়ে প্রসঙ্গেও প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল। হুতোম পেঁচার নক্সায় হুতোম 'হঠাৎ অবতার' - এক বাবুর ছেলের বিয়েতে বর ও বরযাত্রীদের মধ্যে যাত্রার এক বর্ণাঢ্য বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায়, বরযাত্রীদের মধ্যে অনেকে গাড়িতে গেলেও বর কিন্তু যাচ্ছেন পালকিতে। নতুন বউকেও এভাবে পালকি করে নিয়ে আসাই ছিল তখনকার নিয়ম। বিয়েতে পালকির ব্যবহার সে সময় কী পরিমাণে মর্যাদাবোধক হয়ে উঠেছিল। তার অন্তত কিছুটা আন্দাজ দিতে পারবো প্রচলিত এক গল্পকথার উল্লেখ করে : এক বাবু বিয়ে করতে যাচ্ছেন পালকি চড়ে। পথে তাঁর পালকির তাল ছেড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ অন্য পালকি জোগাড় করাও সম্ভব নয়। আবার পালকি ছাড়া বিয়ে করতে যাওয়া। সেওতো ঘোর অমর্যাদার। অনন্যোপায় বাবু তাই ভাঙ্গা পালকি পরিবেষ্টিত হয়ে হেঁটেই চলেছেন বিয়ে করতে।

কলকাতায় শেষ কবে পালকি চড়ে বিয়ে হয়েছিল জানা নেই। তবে পুরনো এই ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের দুর্বলতা, পালকির জনপ্রিয়তা, এইসব দিক বিবেচনা করেই হয়তো কলকাতায় নতুন নতুন পালকি ভাড়া দেবার সংস্থা তৈরি হয়েছে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

রহস্যময় বাল্ট্রা দ্বীপ

গোপাল ব্যানার্জী
পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় জায়গা আছে যেগুলো সাধারণ জায়গার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব জায়গায় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও কম্পাসও কাজ করে না। যার কারণে এসব এলাকায় ঘটে নানা রকমের অদ্ভুত ঘটনা। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ইভান স্যান্ডারসন এই রহস্যময় অদ্ভুত জায়গাগুলোর নাম দিয়েছেন 'ভোরটেঙ'। যার অর্থ ঘূর্ণিপাক। সাধারণত ঘূর্ণিপাক জলেই হয়ে থাকে। তবে ইভান স্যান্ডারসনের মতে, এই ঘূর্ণিপাক জলের নয়, চেতনা-বোধের। তবে বিজ্ঞানী ব্রাড স্টেইজার এ রহস্যময় জায়গাগুলোকে অভিহিত করেছেন 'উইন্ডো এরিয়া' বলে।

বিশ্বের রহস্যময় এরকমই কিছু জায়গা হচ্ছে — কুখ্যাত বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, রহস্যদ্বীপ বাল্ট্রা, রহস্যময় সাইলেন্স জোন, ক্যালিফোর্ণিয়ার নর্থ শান্তার অরিজনের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা প্রভৃতি। তবে উইন্ডো এরিয়াই হোক আর ভোরটেঙই, যাই বলা হোক না কেন বিজ্ঞানীরা এ জায়গাগুলোর অস্বাভাবিকত্ব আর অসামঞ্জস্যতা নিয়ে গবেষণা করেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। এই গবেষকদের অন্যতম একজন সাইকোলজিস্ট ড. স্টেনলি ফিশার। তাঁর মতে, এই এলাকায় প্রবেশ করলে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে ব্যাপক আচরণগত পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে এখানে এসে উদ্ভট ও অস্বাভাবিক সব আচরণ করতে তিনি দেখেছেন। এখানে পা রাখামাত্র যে কোনও মানুষেরই মনে হবে, সে ভিন্ন এক চেতনার জগতে গিয়ে হাজির হয়েছে। পৃথিবীতে এ ধরণের বেশকিছু রহস্যময় অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ সূত্র প্রায় অকার্যকর। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তারা এখানে আরও কিছু অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। যেমন সমান উচ্চতাসম্পন্ন দুজন লোক এসব স্থানে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালে সামান্য দূর থেকে উত্তর দিকে ঘেঁষে দাঁড়ানো লোকটিকে খানিকটা খাটো বলে মনে হয়। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য সন্দেহ নেই, তবে বিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন, একটি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ঘূর্ণিপাক কাজ করছে এই জায়গার ভেতরে, যার প্রভাবে এসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। এখানে জল ঢাললে উপরের দিকে গড়াতে থাকে, অথচ জলের ধর্মই হচ্ছে নিচের দিকে গড়িয়ে নামা। এখানে আগুন জ্বালালে কোনও কারণ ছাড়াই ধোঁয়া শঙ্খাকারে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। এসব আজব ঘটনা 'ভোরটেঙ' ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ঘটতে দেখা যায় না। এখানে কম্পাসের নির্দেশক কোনও একটি জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পুরো এলাকায় কোনও জীবজন্তু নেই। নেই কোনও কীটপতঙ্গও। এ ধরনের রহস্যময় জায়গার একটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের 'বাল্ট্রা দ্বীপ'।

প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি রূপে বেশ কিছু দ্বীপ অমীমাংসিত রহস্য হিসেবে আজ পর্যন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে রেখেছে। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হল বাল্ট্রা। এটি ইকুয়েডরের গ্যালাপগোস দ্বীপপুঞ্জের একটি বিশেষ দ্বীপ। বাল্ট্রা মূলতঃ মানববসতিশূণ্য একটি দ্বীপ। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডরের নিকটবর্তী ১৩টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ম্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জ। আর এই ১৩টি দ্বীপের একটি হচ্ছে বাল্ট্রা।

এখানকার অন্য ১২টি দ্বীপ থেকে বাল্ট্রা একেবারেই আলাদা, অদ্ভুত এবং রহস্যময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কৌশলগত কারণে এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে বিমানঘাঁটি স্থাপন করে মার্কিন সরকার। এরপর থেকেই বিশ্ববাসী জানতে পরে বাল্ট্রা দ্বীপের এই অদ্ভুত রহস্যের কথা। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপপুঞ্জ হওয়ায় এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো বৃষ্টির এক ফোঁটাও পড়ে না বাল্ট্রাতে। কী এক রহস্যজনক কারণে বাল্ট্রার অনেক ওপর দিয়ে গিয়ে অন্য পাশে পড়ে বৃষ্টি। বাল্ট্রার অর্ধেক পার হওয়ার পর অদ্ভুতভাবে আর এক ইঞ্চিও এগোয় না বৃষ্টির ফোঁটা। বৃষ্টি যত প্রবলই হোক এ যেন সেখানকার এক অমোঘ নিয়ম। বাল্ট্রা বাদে এখানকার প্রতিটি দ্বীপেই আছে সিল মাছ, ইগুয়ানা, দানবীয় কচ্ছপ, গিরগিটিসহ বিরল প্রজাতির কিছু পাখি।

বাল্ট্রার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দ্বীপে কোনও উদ্ভিদ, প্রাণী বা কীটপতঙ্গ নেই। বাল্ট্রা আর পাশের দ্বীপ সান্তাক্রুজের মাঝে তিন ফুট গভীর ও কয়েক ফুট চওড়া একটি খাল আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি পরের দ্বীপে এয়ারবেস স্থাপন করে ইউএস সরকার। ফ্রেন্সিস ওয়ানার ছিলেন এখানকারই একজন দায়িত্বরত অফিসার। এ দ্বীপপুঞ্জে থাকাকালীন অদ্ভুত সব ঘটনা আর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি। যেগুলো পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে রীতিমতো বিস্ময়ের ঝড় ওঠে। তিনি লিখেছেন, 'জীবনের সবচেয়ে বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হয়েছি আমি বাল্ট্রা দ্বীপে গিয়ে। একটা নয় দুটো নয়, একের পর এক অসংখ্য অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার ঘটেছে আমার চোখের সামনে। বিস্ময়ে হতবাক আমি শুধু দৃষ্টি মেলে দেখেই গেছি এসব, কোনও যুক্তিযুক্ত উত্তর বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি শক্তি কাজ করছে দ্বীপটির ভেতর। যার প্রভাবে ঘটেছে একের পর এক এসব রহস্যময় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। বাল্ট্রাতে এলেই অস্বাভাবিক আচরণ করে নাবিক বা অভিযাত্রীর কম্পাস। সবসময় উত্তর দিক নির্দেশকারী কম্পাস এখানে কোনো সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার দিক নির্দেশক কাঁটা ইচ্ছেমতো ঘুরতে থাকে অথবা উল্টোপাল্টা দিক নির্দেশ করে কম্পাস। আবার দ্বীপ পার হলেই সব ঠিক। বাল্ট্রার আরেকটি অদ্ভুত দিক হল, এর মানসিক দিক। বাল্ট্রায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে কারও মাথা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। অজানা-অচেনা কোন এক জায়গায় হারিয়ে যাওয়ার আশ্চর্যই রকম অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলে মনকে। বেশিক্ষণ এ দ্বীপে থাকলে দ্বীপ থেকে চলে আসার পর কিছুদিন সেই আশ্চর্য অনুভূতি থেকে যায়। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। অদ্ভুত দ্বীপ বাল্ট্রায় কোন গাছ নেই। নেই কোন পশুপাখি। কোন পশুপাখি এ দ্বীপে আসতেও চায় না। জোর করে এলেও কোনো পশুপাখির বসতি করানো যায়নি। দেখা গেছে, বাল্ট্রাকে এড়িয়ে পাশের দ্বীপ সান্তাক্রুজের ধার ঘেঁষে চলছে প্রাণীগুলো। শুধু তাই নয়, উড়ন্ত পাখিগুলোও উড়তে উড়তে বাল্ট্রার কাছে এসেই ফিরে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন কোনো দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে ওরা। এই দ্বীপের রহস্যের কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশ্য এনরিক ফন দানিকেল ও তার অনুসারীরা যথারীতি তাদের স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই পৃথিবীর বাইরের ভিন্ন গ্রহের তথাকথিত মানুষদের টেনে এনেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজও এ রহস্যের কোন কুলকিনারা করতে পারেননি। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বিশ্ব আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা একদিন হয়তো এসব রহস্যের সমাধান মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

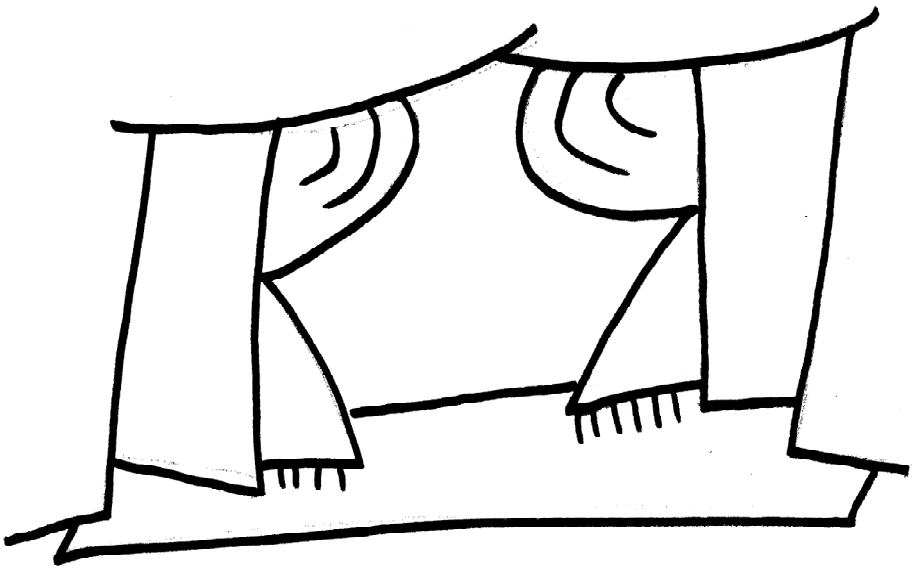

চিরদিনের বিনোদিনী

টিনা পাল
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কালের প্রবাহে যেসব ব্যক্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়, আমাদের আগ্রহ এবং আকর্ষণ একটু বেশিই থাকবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সব ব্যক্তিত্ব সময়ের পাকচক্রে, কালের পদচিহ্নে ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, খ্যাতি বা অখ্যাতি এই দুই জগতের কোনোটিই তাদের কপালে জোটেনি, যারা সময়ের চোরাস্রোতে অন্তঃবাহিনী নদীর মতো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন তাদের সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বা আবিষ্কার দুটোর কোনোটিই যে সচরাচর অনপ্রেরণার আগুনে একটু জ্বলে ওঠে না, তা আমরা সাধারণ মানুষ হিসাবে উপলব্ধি করতে পারি। বিধাতার ম্লান করুণা যে সব প্রতিভাকে মহীরূহ হওয়া থেকে এইভাবে বঞ্চিত করেছে তেমনই এক প্রতিভা শ্রীমতী বিনোদিনী। যাকে আমরা শিক্ষিত সমাজ কিছু চিনলেও 'নটী বিনোদিনী' নামেই জানি। ''আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা, আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে ওমন কেহই নাই'' — এটি এহেন বিনোদিনীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে আত্মজ্ঞাপক জ্বলন্ত শ্লেষোক্তি।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বে প্রতিভাশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস। বিনোদিনী তাঁর জীবনকালের মধ্যেই জনমানসে প্রায় বিস্মৃত হয়ে এসেছিলেন। বিনোদিনীর জন্মকথার যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখি ১৮৬৩ সালে কলকাতার নিতান্ত সাধারণ এক পরিবারে তাঁর জন্ম। বিনোদিনী তাঁর জন্ম সম্পর্কে বলেছেন, ''আমার জন্ম এই কলকাতা মহানগরীর মধ্যে সহায়

সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না; কেননা কষ্টেশিষ্টে একরকম দীন গুজরান হইত। আমার মাতামহীর একখানি বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেকখানি ছিল। সেই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ১৪৫ নম্বর বাটী এখন আমার অধিকারে আছে। সেই খোলার ঘরে অনেকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ্যে করিয়াই আমাদের সংসার নির্বাহ হইত।" — অদ্ভুত লাগে ভাবতে, মাত্র ১২ বছর বয়সে আর্থিক দুরবস্থার জন্য জীবন নির্বাহের তাগিদে বিনোদিনীকে থিয়েটারে আসতে হয়। শুরু হয় তাঁর বিচিত্র রঙিন ভাঙা গড়ার, আশা নৈরাশ্যময় জীবন প্রবাহ।

এইটুকু বলে সংক্ষেপে বিনোদিনী সম্পর্কে ভূমিকা কথা শেষ করলাম। এইবার আসল কথা - 'চিরদিনের বিনোদিনী' এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কিছু কথা বলার চেষ্টা করি। দেখা যাক কতটা সফল হওয়া যায়। যদিও সে বিচারের দায় সচেতন পাঠকের।

তীব্র আর্থিক অনটনের পরিস্থিতিতে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিনোদিনী মাসিক ১০ টাকা বেতনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যুক্ত হন। পূর্বে বিনোদিনীরই বাড়ীতে গঙ্গা বাইজী কর্তৃক সংগীত শিক্ষায় কিছু শিক্ষিত হয়েছিলেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হরলাল রায়ের 'শত্রু সংহার' নাটক অভিনীত হয় ১৮৭৪, ১২ ডিসেম্বর। বিনোদিনী দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় অভিনয় দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন। বিনোদিনী যে সময়কালে থিয়েটারে প্রবেশ করেন তখনও সমাজ সময় ছিল প্রতিকূল। বিনোদিনীর জীবনপথ ছিল কন্টকময়। জীবনে মর্যাদা, প্রেম তিনি পাননি। সমাজ বিনোদিনীকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান, স্থান দেয়নি। তাকে 'বারাঙ্গনা' 'পতিতা' করেই রেখেছে। এহেন বিনোদিনী তাঁর সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে থিয়েটারের স্বার্থে থিয়েটারকে ভালোবেসে। থিয়েটার বিনোদিনীর 'প্রাণাধিক প্রিয় প্রাণ'। বিনোদিনীর ইতিহাস তাঁর আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস কিনা তা সহৃদয় বুদ্ধিজীবী মানুষ আজ বিচার করবেন।

বিনোদিনী তাঁর থিয়েটার-জীবনে তাঁর বেদনার অশ্রুর বিনিময়ে, ত্যাগের বিনিময়ে অভিনয়কে যেন নাটকে, চরিত্রে, সংলাপে ছত্রে ছত্রে গেঁথে দিয়ে গেছেন। পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও বেশি চরিত্রে প্রাণদান করেছেন বিনোদিনী। মাত্র ১২ বছর বয়সে যে মেয়েটি থিয়েটারে যুক্ত হয়েছে - কালের পথে, জীবনের পঙ্কিলতা, জটিলতা, কলঙ্ককে মাথায় করে তাঁর অভিনয় জীবনের ব্যাপ্তিও মাত্র ১২ বছর। কিন্তু এই সময়াবসারে তিনি অভিনয় দিয়ে অভিনেত্রী রূপ খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ক্ষোভ, বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা বিনোদিনীর মর্মে আঘাত করেছে। তাই এই মাত্র বারো বছর অভিনয় জীবনের পরই তিনি স্বেচ্ছা অন্তরালকে চির আলিঙ্গন করেছেন। ফেলে রেখে এসেছেন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার', 'বেঙ্গল থিয়েটার', 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ও 'স্টার থিয়েটার' - এর চির উজ্জ্বল স্মৃতির ক্যানভাস।

গুরু গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিনোদিনী অভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায় তিলে তিলে অর্জন করেছেন। প্রথম নাটকের অভিনয়েই সমগ্র দর্শককে কোন এক মন্ত্রবলে অভিভূত করেছেন। কিছুটা নিজেই যেন বিনোদিনী নিজেরই বশীভূত হয়েছেন। বিনোদিনীর অভিনয় জীবনের পথচলা এরপর যেন বায়ুর বেগে চলতে থেকেছে। পরবর্তী 'হেমলতা' নাটকে নায়িকা হেমলতার ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিনোদিনী ১৮৭৫-এর ৬ মার্চ। আর পিছনে তাকাতে হয়নি তাকে। ধীরে ধীরে তার যাত্রা খ্যাতি প্রতিষ্ঠা গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

সময় কালের দিকে তাকালে দেখা যায় সেই সময় প্রথম স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রী নেওয়া শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা বেঙ্গল থিয়েটারে (১৮৭৩) মাধ্যমে মঞ্চে আসেন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই আসেন বারাঙ্গনা পল্লী থেকে। সেদিনের সমাজ এহেন নারীদের মঞ্চে উপস্থিতিকে

সম্মানের স্থান একেবারেই দিতে পারেনি। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই। সমালোচনার ঝড়ে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। বাংলা পত্র-পত্রিকায় বিরাট সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আছে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতির মতো পত্রিকাও। সব সমালোচনার সমুদ্রে অবগাহন করেই বিনোদিনী তার সমকালকে সমকালীন অভিনেত্রীদের নিজ প্রতিভাগুণে পিছলে ফেলে এগিয়ে গেছেন। প্রাণাধিক প্রাণ থিয়েটার হয়ে উঠেছে তাঁর পরিবার। আর থিয়েটারের কলাকুশীলররা তাঁর কাছে নিজ ভাই-বোন তুল্য বিরাজ করেছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পরবর্তী 'নীলদর্পণ' (সরলা), 'নবীন তপস্বিনী' (কামিনী), 'সধবার একাদশী' (কাঞ্চন), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (ফাতি), 'সতী কী কলঙ্কিনী' (রাধিকা), 'লীলাবতী' (লীলাবতী), 'প্রকৃতবন্ধু' (বনবাল্য), 'সরোজিনী' (সরোজিনী) প্রভৃতি নাটকে তাঁর অসামান্য অভিনয় দক্ষতা দর্শককে অনায়াসে জয় করে নিয়েছে।

সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতিকার আশুতোষ দেবের (সতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদর্শে বিডন স্ট্রীটে (এখন) স্থায়ীভাবে গড়ে উঠেছিল বেঙ্গল থিয়েটার। বিনোদিনীর 'মেঘনাদবধ' নাটকে প্রমীলার চরিত্রে অভিনয়ের চমৎকারিত্ব প্রশংসা কুড়িয়েছে। বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এখানে বিহারীলাল, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমারী দেবী (বিমলা ও গিরিজায়া), প্রমুখের সঙ্গে মনোরমা চরিত্র বিনোদিনীর অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দর্শক। বিনোদিনী অভিনয়কে তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন — ''আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।'' কপালকুণ্ডলাতে মনোরমার চরিত্রে অভিনয় করা ছিল বিনোদিনীর কাছে চ্যালেঞ্জিং। বিনোদিনী তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আরোপ করে কপালকুণ্ডলাকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৭৭, ২৯ এপ্রিল) তে আয়েষা ও তিলোত্তমার মতো বিপরীতধর্মী চরিত্রে দ্বৈত ভূমিকায় বিনোদিনীর সহজ বলিষ্ঠ অভিনয় এক রোমান্টিক ক্লাসিক মহিমা দান করেছে।

১৮৮০ সালের শেষদিকে ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নিলামে উঠলে প্রতাপচাঁদ হুজুরী তা কিনে নেন এবং তিনি গিরিশ ঘোষকে ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন তার থিয়েটারে। এই থিয়েটারে 'জামীর' নাটকে গিরিশ ঘোষের বিপরীতে লীলা চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। এখানে 'মেঘনাদবধ' নাটকে একা বিনোদিনী ৭টি চরিত্রে অভিনয় করেন। বিনোদিনীর থিয়েটার জীবনের এই সময়কালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখব এরপর তিনি কুন্দনন্দিনী (বিষবৃক্ষ), ফুলহ (মায়াতরু), সাহানা (মোহিনী প্রতিমা), বাদশাহ কন্যা ও পরী (আলাদীন), লহনা (আনন্দরহো), সীতা (রাবণবধ), লব (সীতার বনবাস), উত্তরা (অভিমন্যুবধ), কৈকেয়ী (রামের বনবাস), সীতা (সীতাহরণ), হেমলতা (মাধবীকঙ্কণ), ও দ্রৌপদী (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) প্রভৃতি বিচিত্রানুগ অভিনয় দিয়ে থিয়েটারে জীবন্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। গীতিনাট্য 'মায়াতরু' তে 'ফুলহাসি' চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় প্রতিভাকে 'রিজ অ্যাণ্ড রায়ও' পত্রিকায় Binodini was simply charming — রূপে প্রতিক্রিয়া জানায়।

পৌরাণিক নাটকে বিনোদিনীর স্বতঃপ্রণোদিত ভাবমূর্তি আমাদের সামনে চিরন্তন নারীর মহিমান্বিত রূপকে শাশ্বত করে রাখে। নাটকের সাজসজ্জা সম্পর্কে বিনোদিনীর রুচি ও পারিপাট্য গুরু গিরিশ তথা দর্শককুলকে মুগ্ধ করে রাখত। বিনোদিনী নাটকের চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতেন। সীতায় সীতা চরিত্রে আবেগ, যন্ত্রণা, ভক্তি, বাৎসল্যের সাথে বিনোদিনী অন্তরঙ্গ ভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন। আমরা বিনোদিনীর থেকে সীতাকে আলাদা করতে পারি না। পরবর্তীতে স্টার থিয়েটারেও আমরা দেখব দময়ন্তী (নল-দময়ন্তী),

চণ্ডী ও খুল্লনা (কমলেকামিনী), পদ্মাবতী (বৃষকেতু), চিন্তা (শ্রীবৎস-চিন্তা), সত্যভামা (প্রভাস-যজ্ঞ), গোপাল (বুদ্ধদেব চরিত), চিন্তামণি (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর) প্রভৃতি চরিত্রের গভীরতাকে তিনি অসাধারণ স্তরে উপনীত করেছিলেন। অভিনয় করার সময় বিনোদিনী ভক্তিরসে বিভোর হয়ে যেতেন। 'চৈতন্যলীলা' করার সময় এমনই রূপ দর্শক দেখেছেন বারবার। কখনো কখনো করুণভাবে বিভোর হয়ে চৈতন্য হারিয়েছেন বিনোদিনী। এসবই তাঁর একান্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত। আমরা যদি সংস্কারের বেড়া পেরিয়ে অন্তর দিয়ে দেখি তাহলে আমাদের সামনে এক বঞ্চিতা নারীর যন্ত্রণাময় হৃদয় দ্বারাই উন্মোচিত হতে দেখব। রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকট যে তার 'নিজগুণেই অধিক' একথা অস্বীকার করার সত্যই জায়গা নেই।

বিনোদিনীর অভিনয়ের মধ্যেই যেন নিহিত ছিল তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা। নিজেকে তিনি পতিতা বলেছেন। নিজের ভাগ্যের পরিহাসের মধ্যেই তাঁর পথচলা। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজের অন্তরকে যেন নিবেদন করেছেন তিনি। অমৃতলাল বসু বিনোদিনীর উদ্দেশ্যে মাত্রদ্ধভাবে বলেছেন — ''শ্রী শ্রীচৈতন্যদেবের কত দারুমূর্তি, কত চিত্রপট দেখিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে গেলেই আমি বিনোদিনীকে ধ্যানচক্ষে দেখি''। এতো বিনোদিনীর চিরন্তনত্বেরই প্রতীক। সত্যই কি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এ এক পতিতা বা বারবণিতা নারীর অভিনয়? আমরা কি পারি না কেবলমাত্র এক নারীর নারীত্ব, ভক্তি, চিরন্তনতাকে শাশ্বত করে রাখতে?

স্টার থিয়েটারের ইতিহাস বিনোদিনীর জীবনে এক বেদনার ইতিহাস। যা তাকে চরমভাবে আঘাত করেছে, জীবনকে অন্ধকার অন্তরাল উপহার দিয়েছে। স্টারের স্বার্থে বিনোদিনীকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এই সময় গিরিশ ঘোষ নতুন থিয়েটার গড়তে চাইছিলেন। গিরিশ ঘোষ নতুনভাবে থিয়েটার গড়ে তোলেন ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি। গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হিসাবে স্টারের কর্মযজ্ঞে বিনোদিনীকে আহুতি দেওয়া হয়। থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসার, গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিনোদিনী হয়েছে গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা। এটুকু হয়তো তাঁর স্বপ্ন ছিল যে নতুন থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনী থিয়েটার। নিদেনপক্ষে বি-থিয়েটার। এই স্বপ্নে বিনোদিনী নতুন করে নাট্যশালা গড়ায় মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন। তাঁর বহু প্রমাণ, অভিজ্ঞতা বিনোদিনী স্বয়ং তাঁর আত্মকথা আমার কথায় আমাদের জানিয়ে গেছেন। কিন্তু দেখা গেছে ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছে 'স্টার থিয়েটার' বিনোদিনীর স্বপ্নভঙ্গের লাঞ্ছনার বঞ্চনার নব অধ্যায়। স্টারের নামকরণের পিছনে যুক্তি ছিল যে পতিতা এক নারীর নামে যদি থিয়েটার হয় তবে সাধারণ দর্শক টানবে না থিয়েটার। সোজা কথায় ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্ভাবনাকে জায়গা দিতে পারে না তারা। এই কি প্রাপ্য ছিল বিনোদিনীর? হয়তো এক নারীর এটুকুই মূল্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অথবা ব্যবসায়ী মানুষের কাছে। বিনোদিনীকে পতিতা নামাঙ্কিত সিলমোহরই এঁটে দেওয়া হল। তাকে যোগ্য সম্মান তো দিলই না, বরং কল্পনাতীত বঞ্চনা উপহার দিল থিয়েটার। আমাদের মনে করতে বাধা নেই যে এটি পূর্ব পরিকল্পিত বই নয়। বিনোদিনী আমার কথায় লিখেছেন — ''আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন অসৎ ব্যবহার করিবেন। তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই।''

এই স্টারের উদ্বোধনী নাটকে 'দক্ষযজ্ঞ' — দক্ষের (গিরিশ) ভূমিকায় গিরিশ অভিনয় করেন, এবং সতীর ভূমিকায় বিনোদিনী অনবদ্য অভিনয় দিয়ে ভরিয়ে দেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রযোজনা ছিল। দক্ষের অপমানে সতীর দেহত্যাগ — আমাদের একথাই ভাবায় বঞ্চিতা বিনোদিনীর রঙ্গালয় ত্যাগকেই। পাঠক আজ একথাই উপলব্ধি করবেন বইকি বিনোদিনীর অভিনয় জীবনে চিরকালের জন্য ভাঁটা পড়ে গেল। মাত্র তিন বছরের মধ্যে

স্টার থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলেন বিনোদিনী। তবুও স্টারেই বিনোদিনীর থিয়েটার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনীর যুগলবন্দি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিনোদিনীর মতো বড়ো মাপের অভিনেত্রী বাংলা রঙ্গমঞ্চে সত্যই দুর্লভ। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সব চরিত্রেই বিনোদিনী অনন্যা। সীতা, দ্রৌপদী, প্রমীলা, রাধিকা, দময়ন্তী, উত্তরা, চিন্তামণি প্রভৃতি পুরাণের নায়িকার পাশাপাশি কামিনী, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, বিলাসিনী, কারফরমা, রঙ্গিনী ইত্যাদি সামাজিক চরিত্রগুলিকেও তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। আবার আয়েষা, আসমানি, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবির মতো ঐতিহাসিক নায়িকারাও যেন তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিনোদিনীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাব ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিনোদিনীর অভিনয়ের আকর্ষণে স্টার থিয়েটারে এসেছিলেন ১৮৮৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। চৈতন্যলীলায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন ''মা, তোর চৈতন্য হোক''। রামকৃষ্ণদেবের এই বাণী বিনোদিনীর কাছে অমৃতময়। রামকৃষ্ণদেবের এই আশীর্বাদ তাঁর জীবনের পাথেয় হয়ে থেকেছে। বিনোদিনীকে সাধনার এক উচ্চ স্তরে উপনীত করেছিল এই বাণী। বিনোদিনীর মলিন, দুঃখময় জীবনে কিছুটা শান্তির বার্তারূপে কাজ করেছে। বিনোদিনীর জীবনের মলিনতা যেন ধুয়ে মুছে গিয়েছিল।

'নটী বিনোদিনী' আসলে প্রতীক। 'নটী বিনোদিনী' Myth হল সর্বসাধারণকে নিয়ে তো মিথ তৈরি হয় না। বিনোদিনী নিজের অজান্তে সেই জায়গা তৈরি করে গেছেন। নারী সংগ্রামের এক Universal image ছিলেন বিনোদিনী। তৎকালীন সমাজে রান্নাঘর, বাসর ঘর, আঁতুর ঘর, কিংবা ঠাকুর ঘরের দেওয়াল ভেঙে এই চতুর্ভুজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বিনোদিনী। ভাবলে অবাক হতে হয়, বিনোদিনী ছিলেন এশিয়ার প্রথম মহিলা, যিনি 'আত্মজীবনী' রচনা করেছেন। তিনি শুধু অভিনেত্রীই নন একজন বলিষ্ঠ লেখিকাও। তাঁর এই আত্মজীবনী যদি না থাকত, তবে হয়তো আমরা আজ এই নারীকে বুঝতাম না চিনতাম না। বিনোদিনী অনুভূতিশীল মানুষের কাছে নিজেকে চিরন্তন করে গেছেন। আজ আমরা তাকে আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দেব — এটিই ধ্রুব হয়ে থাকুক। সময় এসেছে রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বের সাথে আজ একই আসনে একই মালায় বিনোদিনীকেও বরণ করবার। আজ বাঙালি থিয়েটারকে জানে, ভালোবাসে। আজ মানুষ জানুক থিয়েটারের এহেন মানুষের কথা। পাঠক আমরা আর একটু অগ্রসর হয়ে ভাবি যেন সরকারি বা বেসরকারিভাবেই হোক অন্ত বিনোদিনীর নামে একটি নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠুক। বিনোদিনীর মতো মানুষকে, এক অভিনেত্রীকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান যেন আমরা চিন্তাশীল সমাজ দিতে পারি। বিনোদিনী আমাদের কাছে 'নটী বিনোদিনী' হবেন না। তিনি বিনোদিনী দেবী রূপেই আমাদের হৃদয়ে চিরবিরাজমান থাকুন।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

জন রলস-এর ন্যায় তত্ত্ব

সুমিতা দেবনাথ
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জন রলস বিংশ শতাব্দীর সবথেকে প্রভাবশালী রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন। সমাজে কীভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় এটাই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়। রলস সামাজিক চুক্তি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রথম থেকে উপযোগিতাবাদের বিরোধিতা করেছেন। ১৯৭১ সালে তিনি 'A Theory of Justice' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। রলস-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক ন্যায় বা কীভাবে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ন্যায়ের ধারণাটিকে তিনি কোন ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি, সম্পূর্ণভাবে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। সমাজ কাকে বলে — এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে সমাজ জনগণের সমন্বয়ে গঠিত, যারা পারস্পারিক কিছু সুবিধা লাভের আশায় ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বভাবতই সমাজবদ্ধ জনগণের মধ্যে স্বার্থের মিল লক্ষণীয়। কিন্তু একই সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতও লক্ষ্য করা যায় বলে রলস মনে করেন। এর ফলে যে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি হয় সেটি জনগণের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে সে ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। রলস মনে করেন সামাজিক সম্পদের বণ্টন সম্পর্কিত নীতিটি ন্যায়সঙ্গত হলেই সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রলস দুটি ধারণার কথা বলেন। প্রথমটি হল 'প্রারম্ভিক অবস্থান' (original position) এবং দ্বিতীয়টি হল অজ্ঞতার ওড়না (veil of ignorance) নামে পরিচিত। রলস-এর মতে original position- এ জনসাধারণ veil of ignorance-র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে ন্যায় সম্পর্কিত নীতিগুলিকে প্রণয়ন করেছিল। Veil of ignorance বলতে বুঝিয়েছেন এটি এমন এক অবস্থা যেখানে জনসাধারণ তাদের নিজেদের এবং অপরের ক্ষমতা বা অক্ষমতা গুণ বা ত্রুটি ভালো বা মন্দ ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভৃতি কোন দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। রলস মনে করেছিলেন যে original position এ veil of ignorance এর মধ্যে থাকা জনসাধারণ সামাজিক সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত যে নীতিগুলি প্রণয়ন করবে সেগুলি সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত নীতি। রলস-এর মতে, original position এ ব্যক্তিরা নিজেদের এবং অন্যান্যদের ক্ষমতা বা অক্ষমতা গুণ বা ত্রুটি ইত্যাদি সমস্ত কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। সেই কারণে ভবিষ্যৎ সমাজ কাঠামো তাদের কী অবস্থান হবে সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থাকে। এই অবস্থায় তারা স্বাভাবিকভাবে এমন একটি সমাজ গঠন করার চেষ্টা করবে যেখানে সাম্য থাকবে। কিন্তু রলস এর মতে সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং কাঙ্ক্ষিত নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেহেতু সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সেই কারণে রলস-এর ন্যায় সম্পর্কিত প্রথম নীতিটি রাজনৈতিক অধিকারকে কেন্দ্র করে 'equality principle' নামে পরিচিত।

অপরদিকে রলস মনে করেন অর্থনৈতিক অধিকার গুলির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্য বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর মতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করলে সেটি সামগ্রিকভাবে সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। তাঁর মতে ধনী সম্প্রদায়ের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে যদি তাদের উপার্জিত অর্থ দরিদ্র

শ্রেণীর উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে কিছু পরিমাণের অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রলস মনে করেন 'original position' এ 'Veil of ignorance' থাকা ব্যক্তিরাও উপযোগীতাবাদী নীতি অনুসরণ করে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বোচ্চ সুখ এই মতবাদটি গ্রহণ করতে পারেন। কারণ ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির কী অবস্থান হবে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন। সেই কারণেই রলস মনে করেছিলেন যে যদি কোন ভাবে অর্থনৈতিক অসাম্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন ভাবে সুবিধা দেয় তবে original position এ থাকা ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক অসাম্যকে গ্রহণ করবে। সেই কারণে সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত রলসের দ্বিতীয় নীতিটি 'different principle' নামে পরিচিত।

রলস তাঁর প্রথম নীতিতে যে অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার থেকে বোঝা যায় যে মূলত উন্নত, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে তার নীতিগুলি প্রযোজ্য। রলস-এর সামাজিক তত্ত্বে different principle এর সাহায্যে অর্থনৈতিক অসাম্যকে যেভাবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন সংক্ষেপে সেটি 'ম্যাক্সিমিন নীতি' নামে পরিচিত। তাঁর মতে এই ম্যাক্সিমিন (সব থেকে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির সর্বাধিক হিত সাধন) হবে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজের আবশ্যিক কাজ। অর্থাৎ যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করছেন যদি তাদের মনে হয় যে কোনোদিন ওই সর্বনিম্ন অবস্থায় তারাও অবস্থান করতে পারেন তাহলে তারা ম্যাক্সিমিন নীতিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেবেন। আদিম পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে ভবিষ্যতে তারা কোন অবস্থায় থাকবেন। সুতরাং তারা ওই সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকতে পারেন এই সম্ভাবনা তাদের ধরে নিতে হবে। তারপরে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে সবাই চাইবে এই সর্বনিম্ন পরিস্থিতির উন্নতি সাধন, যাতে সবথেকে খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়লেও তাদের উন্নতি হয়। এইভাবে যদি সমাজের ভাবী চরিত্র নির্ধারিত হয় তাহলে উৎপন্ন হবে নৈতিক সমাজ ও নৈতিক রাষ্ট্রের কাঠামো।

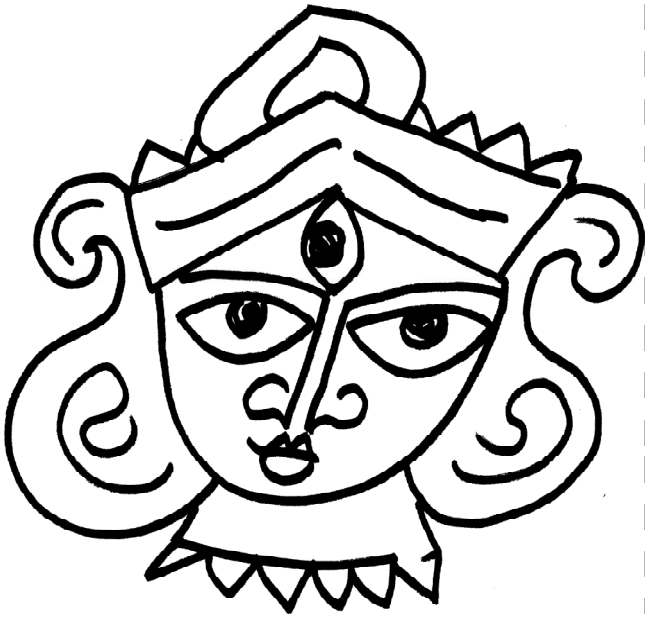

বেদ - উপনিষদে দেবী দুর্গা

ডঃ কাজল দে
প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গা গায়ত্রীটি হল — 'কাত্যয়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন।

বৈদিক সাহিত্য এবং উপনিষদ সাহিত্যেও শক্তিপূজার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে শক্তিবাদের চর্চা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে।

ব্রহ্ম ও তার শক্তি অভিন্ন — এই শক্তিসিদ্ধান্তটি কেনোপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা যায়। দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবতারা ভাবলেন তাঁরা নিজশক্তিতেই বিজয়লাভ করেছেন। তাঁদের এই মিথ্যা অভিমান দূর করার জন্য স্বয়ং ব্রহ্ম যক্ষমূর্তিতে দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। তখন দেবতারা অগ্নিকে যক্ষরূপী পুরুষের কাছে পাঠালেন। যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন - 'তোমার নাম ও শক্তি কী?' অগ্নি বললেন - 'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি তা সব দগ্ধ করতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সামনে একটি তৃণ রেখে তাকে দগ্ধ করতে বললেন। অগ্নি সমস্ত শক্তি দিয়েও সেই তৃণখণ্ড দাহ করতে ব্যর্থ হলেন। এই একইভাবে বায়ু আপন শক্তির গর্ব নিয়ে ব্রহ্মের কাছে এলেন এবং যথারীতি ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেলেন। এই সময় ব্রহ্ম অন্তর্ধান করলেন এবং তার বদলে উমা হৈমবতী দেবতাদের দর্শন দিয়ে জানালেন ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবগণ শক্তিশালী এবং যুদ্ধ জয়ে সমর্থ হয়েছেন।

এই শক্তি উপলব্ধি ভারতবর্ষের সনাতন এক উপাসনার রীতি ছিল। উত্তর বৈদিক কালেও এই চর্চা অব্যাহত ছিল।

মহাশক্তিরূপিনী দেবী দুর্গা বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক দেবতা এবং সকল কিছুই। আধ্যাত্মিক জগতে ইনিই পরমেশ শক্তি পরমা প্রকৃতি। অদ্বৈতবেদান্তে দেবী নির্গুণ, সগুণ, অব্যক্ত, ঈশ্বর বা প্রজা। জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার উন্মেষে ইনিই আবার হিরণ্যগর্ভরূপী প্রজাপতি ব্রহ্মা। বিরাটরূপে ইনিই পুনরায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপিনী। দেবী দুর্গা সুতরাং বিশ্বোত্তীর্ণা ও বিশ্বগতা দুই-ই। বিশ্বগতারূপে দেবী দুর্গা পরমৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ প্রতীক, এবং বিশ্বোত্তীর্ণারূপে ইনি নির্গুণ শিবরূপী শিব। তন্ত্রকার এজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন মিথুনাত্মক-চনকাকারে শিবশক্তি একাত্মক। শিব ও শক্তির মধ্যে অবিনাভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ শিব ও শক্তি দুইয়ে মিলে এক ও অখণ্ড। তন্ত্রকার তাই সৃষ্টি করলেন দার্শনিক মত শাক্তাদ্বৈতবাদ। শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈত-শিবই তন্ত্রের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম। দেবী দুর্গার উপাসক তাই সাকার ও সগুণরূপেই পূজা করেন জগজ্জননীকে, কারণ নিরাকার ও নির্গুণভাবে উপাসনায় উপাস্য-উপাসকের বালাই থাকে না। সাকারকে অবলম্বন করেই উপাসক নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করেন। তবে আসলে সচ্চিদানন্দরূপিনী দুর্গা সগুণ ও নির্গুণের অতীত। বাচ্য ও বাচকের এবং রূপ ও অরূপের পারে অখণ্ডচৈতন্য।

সপ্তশতী শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীদেবীর বিকাশ বা সৃষ্টিরহস্য থেকে দেবী দুর্গার সৃষ্টির ও দেবীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর ''মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা'' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন — ''সপ্তশতী চণ্ডীতে শ্রীশ্রী চণ্ডিকা প্রকৃতপক্ষে মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীরই অভিন্ন মূর্তি - সে অভিন্ন মূর্তির প্রকাশ ও মহিমা শ্রীশ্রী দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা। সমগ্র বিশ্ব তথা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকামণ্ডিত প্রকৃতি মহাশক্তিরই প্রতীক এবং এই মহাশক্তিরূপিনী মহাশক্তিই সৃষ্টি পালন ও সংহারকারিণী শ্রীশ্রী দুর্গা - যিনি ধ্বংস ও মৃত্যুরূপ দুর্গতি নাশ করে শান্তি ও কল্যাণ বিধান করেন।

প্রকৃতপক্ষে সূর্যের তিনটি রূপেরও কল্পনা করা হয় — প্রাতঃ বা প্রাতকালীন সূর্য, মধ্যাহ্ন বা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য এবং সায়ং বা সায়ংকালীন সূর্য। এভাবেই দেবী দুর্গার মূর্তিও তিনভাবে কল্পনা করা হয় - দেবী সরস্বতী প্রাতঃকালীন সূর্য, দেবী দুর্গা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য এবং দেবী লক্ষ্মী সায়ংকালীন সূর্য। মহাশক্তিময়ী একই দেবী বা দেবতা, কিন্তু নাম, রূপ, মন্ত্র ও উপাসনা ভেদে তিন রূপ বা প্রকাশ।''

দুর্গা শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল দুর্গ + স্ত্রী আ (টাপ্)। দ-কার দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ননাশ, র-কার রোগনাশক, গ-কার পাপনাশ ও আকার ভয়শত্রুনাশ হেতু দুর্গা। দেবী দুর্গার নামভেদের অন্ত নাই। এক-একটি পুরাণে দুর্গার বিভিন্ন রকম নামের উল্লেখ আছে। শৈলপুত্রী-পার্বতী ও দাক্ষায়নী-সতী ও নাগরাজকন্যা-উমা কোন কোন পুরাণের মতে এক আবার কোন কোন পুরাণ ভিন্ন বলে। সপ্তশতী চণ্ডীর দেবীকবচে নয়টি নামের উল্লেখ আছে — শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, কুষ্মাণ্ডা, চন্দ্রঘন্টা, স্কন্দমাত, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী —

''প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘন্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।''

ভগবতী চণ্ডিকাদেবী যাবতীয় শক্তিসমষ্টির মূর্ত প্রকাশ। সেই শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন বলেই শ্রী শ্রী চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে মহাদেবী 'ব্যাপ্তিদৈব্যৈ' বলে অর্চিত হয়েছেন। 'দেবীসূক্তে'ও ভগবতী নিজেই বলেছেন — 'অহং রাষ্ট্রী'। কি গোষ্ঠী, কি সমাজ, কি বা রাজতন্ত্র প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমবায় - শক্তিতেই মহাদেবীর লীলা। দেবী দুর্গাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার অভিপ্রায়ে মহাদেব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণদেব দিলেন শঙ্খ, অগ্নিদেব দিলেন শক্তি এবং পবনদেব দিলেন ধনুর্বাণ; ইন্দ্র দিলেন বজ্র এবং ঘন্টা, যম দিলেন কালদণ্ড, প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন রুদ্রাক্ষ এবং কমণ্ডলু; বিশ্বকর্মা দিলেন কুঠার এবং অভেদ্যকবচ, গিরিরাজ হিমালয় দিলেন দুর্গার বাহন সিংহ আর কুবের দিলেন সদা পরিপূর্ণ পানপাত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবগণের শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, এমনকি সমুদ্র এবং পর্বত থেকেও শক্তির উপাদান লাভ করে, যেমন — মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছিলেন, তেমনই রাষ্ট্রগঠনেও রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও আইনকানুন এই সমস্ত শক্তির সংহতিতেই রাজতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, পৃথক পৃথকভাবে কোনও শক্তিই কার্যকারিণী নয়। গোষ্ঠী এবং সমাজের পক্ষেও ঐ একই কথা। গোষ্ঠী থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকেই রাষ্ট্র। সুতরাং যিনি 'রাষ্ট্রী' তিনি সর্বক্ষেত্রেই মূলাধার অর্থাৎ ঈশ্বরী। শক্তিময়ী সেই রাষ্ট্রী শক্তি উদ্বুদ্ধ হলে জীবের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হতে পারে। শ্রী শ্রী চণ্ডীর মূল তত্ত্ব এটাই।

শ্রী শ্রী চণ্ডী মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত। এতে মহাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে বলে 'দেবীমাহাত্ম্য' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রী শ্রী চণ্ডীর তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশো শ্লোক আছে। তাই এর আর এক নাম সপ্তশতী। প্রথম চরিত, দ্বিতীয় চরিত ও তৃতীয় চরিত — এই তিন চরিতে এই গ্রন্থ বিভক্ত। মহাময়াদেবী সনাতনী ও নিত্য হলেও, তাঁর মায়ায় ত্রিভুবনের সকলে, এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব পর্যন্ত মুগ্ধ এবং 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি তখনই মহাশক্তিরূপে তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষ হন। এটাই বোঝবার জন্য মধু-কৈটভ-দৈত্যবধ, মহিষাসুরবধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যবধ যথাক্রমে প্রথম চরিতে, দ্বিতীয় চরিতে ও তৃতীয় চরিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রলয়কালে যখন বিষ্ণুমহামায়ার প্রভাবে অনন্তনাগের উপর শুয়ে যোগনিদ্রামগ্ন ছিলেন এবং ব্রহ্মা তার নাভিমূলে উৎপন্ন পদ্মাসনে বসে নূতন সৃষ্টির কল্পনা করছিলেন, তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটি অসুর জন্মে ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মার স্তবে মহামায়া প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণুর দেহ ত্যাগ করলে, যোগনিদ্রাভঙ্গে তিনি জাগ্রত হয়ে ওঠেন। এরপর বিষ্ণুর সঙ্গে অসুর দুটির যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বিষ্ণুর চক্রে তাদের মস্তক ছিন্ন হয়। প্রথম চরিতে দেবীর এই লীলার বিবরণী পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চরিতে মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গ। অসুরদের রাজা মহিষ ত্রিভুবনের অধিপতি হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসন পর্যন্ত কেড়ে নেয় এবং তার প্রতাপে দেবতাদের স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয়। দেবতারা মহামায়াদেবীকে স্তবস্তুতি করে প্রবুদ্ধ করেন এবং তাঁর শক্তির উপাদান তাঁকে দিলে, তাঁর সাহায্যে মহিষাসুর বধ হয়। তৃতীয় চরিতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দৈত্যের বধ-বৃত্তান্ত রয়েছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ ছিল দুই সহোদর ভ্রাতা। মহিষাসুরের ন্যায় তাদের প্রতাপেও দেবগণের স্বর্গচ্যুতি ঘটে। তখন আবার দেবতাদের স্তবস্তুতিতে কৌষিকীদেবীরূপে তিনি আবির্ভূতা হন। সঙ্গে সঙ্গে কালী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্রের মাতৃকা শক্তি উৎপন্ন হয়ে অসুর বধে কৌষিকীকে সাহায্য করেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনানী ধুম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড ও রক্তবীজ-বধের পর শুম্ভ-নিশুম্ভও এই শক্তির হস্তে নিহত হয়। শ্রী শ্রী চণ্ডীর মূল আখ্যায়িকা-বৃত্তান্ত এই তিনটি চরিতে রয়েছে।

আদিতে যোগমায়ারূপিণী মহাশক্তি অপ্রকটিত। মধ্যাবস্থায় পুরুষের শক্তি সহযোগে চণ্ডিকা বা জয়ারূপে তাঁর মূর্ত প্রকাশ। তারই পরিণতিতে পার্বতীর দেহজাত কৌষিকী পুরুষেরও প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ বহির্বিকাশ। তখন

যাবতীয় শক্তি মহাশক্তিরই অনুগত। ক্রমবিবর্ত্তনে মূল প্রকৃতির শক্তি বিকাশের এই ধারাই পূর্বে আলোচিত তিনটি চরিতে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হয়েছে। সৃষ্টিলীলার রহস্যও এটাই।

মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন দুর্গাস্তব করেছিলেন। তারপর থেকেই ভারতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতিতে দুর্গাস্তব হয়ে উঠে সার্বজনীন। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী রূপান্তরিত হয়েছেন মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা দুরীকরণের প্রতীক হিসাবে।

পরবর্তীকালে মহিষাসুর-মর্দন কিংবা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী তাঁর প্রমথবাহিনী নিয়ে একক সত্তায় অসুরদলনে মত্তা। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণের যুগ থেকে যেখানে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র শ্রীদুর্গার অকালবোধন করছেন - সেক্ষেত্রে দুর্গা এক বৃহৎ পরিবারের জননীরূপে উপাসিতা - লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ - এঁরাও মাতৃশক্তির সহায়ক-সহায়িকা। দুর্গাপূজার মধ্যে দুর্গার এই সপরিবার প্রতিমার সৃজন কোন আকস্মিক উদ্ভাবন নয়। এই সপরিবার মাতৃশক্তি রূপকল্পনার মধ্যে নিহিত আছে মধ্যযুগের রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙালীর নিরাপত্তাবোধের আকুতি।

তুর্কি আক্রমণ এবং পাঠান আক্রমণ যখন সুরে বাংলার পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে তছনছ করছিল, তখন দুর্গাপূজার এই পারিবারিক প্রতিমা বাঙালির কাছে নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। এই মহান পরিবারের মাথার উপর পিনাকপাণি শূলপাণি মহাদেব, মা রম্যকপার্দিনী দশপ্রহরণধারিণী শৈলসুতা। একদিকে পার্থিব ঐশ্বর্যরূপিনী লক্ষ্মী, অন্যদিকে বিদ্যাস্থানে বাগ্‌দেবী। সঙ্গে আছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ ও দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। অর্থাৎ সমগ্র পরিবারের মধ্যে ঝলসে ওঠে পরম বীর্যসত্তা যা ভক্তদের আশ্বাস দেয়। বাঙালি চণ্ডীপাঠ করে 'ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব'।। (শ্রীশ্রী চণ্ডী ১১।৩৫)। তাই বাঙালির দুর্গাপূজা বেদ উপনিষদের ধূসর অতীতের মাতৃকাশক্তির অনুসারী হলেও মা দুর্গা হয়ে উঠেছেন ত্রিতাপজনিত বাঙালির প্রাণের ঠাকুর। তাই আজও সহজসংস্কারে বাঙালী যে কোন কাজের সূচনায় দুর্গানাম করে, বিদায়কালে দুর্গাস্তব করে। বাঙালি সংস্কৃতি ও উপাসনা কখনই আর্যসংস্কৃতির মত অতটা মসৃণ ও ধ্যানগম্ভীর ব্রহ্ম উপলব্ধির মত নয়। বাঙালি দনুজদলনী দশভূজাকে নিজের ঘরের মা হিসাবে আত্মীয়তার বোধে বেঁধে ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ রচিত অষ্টাদশ শতকের শাক্তগীতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) শ্রী শ্রী চণ্ডী; স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২।
২) মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা; স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক রচিত। কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৯০।
৩) শ্রী শ্রী চণ্ডীর উপাখ্যান; শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক রচিত। কলিকাতা : এ. মুখার্জী এ্যন্ড কোম্পানি, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

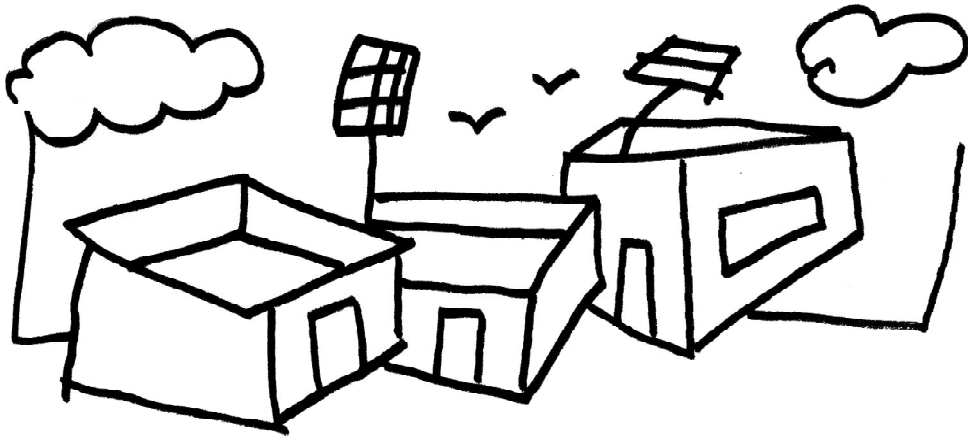

Akhteruzzaman Elias' Khwabnama : Book of Unfinished Dreams

Prof. Shinjini Basu
Dept. of English

So it (Pakistan) was a word born in exile which then went East, was born across or translated, and imposed itself on history; a returning migrant, setting down on the partitioned land, forming a palimpsest on the past...to build Pakistan it was necessary to cover up Indian history...It is possible to see the subsequent history of Pakistan as a duel between two layers of time, the obscured world forcing its way back to what had been imposed. It is the true desire of every artist to impose his or her vision on the world; and Pakistan, the peeling, fragmenting palimpsest, increasingly at war with itself, may be described as a failure of the dreaming mind....perhaps the place was just insufficiently imagined, a picture full of irreconcilable elements....

(Rushdie, 112)

The birth of Bangladesh has always been seen as entropy in the project of Pakistan. The insufficient imagination that Rushdie talks about in the above mentioned lines of Shame (1983) is the imagination of Pakistan in which Bangladesh appears as a gorge, too deep to be filled with the stuffing of Islamic brotherhood. As a result, in the historical imagination of the post-colonial subcontinent, Bangladesh always remains an instance of double secession; from a whole called India a whole called Pakistan was separated. From an imperfect whole called Pakistan, another whole called Bangladesh was separated. Precisely that is why, Rushdie's emphasis on the 'cover-up' of Indian history. I would like to argue that instead of covering up Indian history, the particular turn that the project of

Pakistan took in the form of Bangladesh had actually opened up the fissures of the historical process itself. To look at Bangladesh as an 'insufficiency' in the historical imagination of the nation leaves ground for the possibility of a sufficiently imagined nation-state whereas Bangladesh is a viable proof of the failacy of any such possibility. I would like to take up Khwabnama *(Tale of Dreams)* (1996), the seminal novel of Akhteruzzaman Elias (1943-97), one of the towering figures not only of Bangladeshi literature, but of Bengali literature of the twentieth century, as an ambivalent testimony of the anxieties regarding this unfinished imaginarium of the nation state - ancieties of formulating not merely an authentic national history but also a corroborative linguistic history, while being constantly aware of the fact that the two histories may contradict rather than confirm each other.

In this novel Elias travails through a massive historical body accumulated across unfinished geographies and incomplete political experiments. To quote Michel de Certeau, "The violence of the body reaches the written page only through absence" (de Certeau, 3). Elias's journey is also inside this historical body, right into its underbelly where silences ooze out of the violated social body and its very presence radiates the traces of absences, of bodies that have been 'washed away' from the shores of historical time (ibid). Elias seems to visualize the destination of this journey as a moment of 'confrontation', in the sense of both 'being-opposed-to' and 'being-face-to-face-with' (Chakraborty, 101) another. Elias's Khwabnama is a testimony of that moment when the political discourse finds itself appositionally located with the life of a community living at the limits of history. The novel recounts the effect of the Pakistan movement in a small village in Bagura, a district in the northern part of East Pakistan, primarily inhabited by fishermen and farmers. The main characters of this novel are Tamiz - a fisherman who wants to become a farmer and his father, a man living an almost vegetable life yet revered by people for supposed supernatural powers of interacting with spirits and interpreting dreams. The source of his powers is the Khwabnama - a book of signs where one can read meanings of dreams. This book belonged to a fakir Chirag Ali, an itinerant singer whose own granddaughter Kulsum is the second wife of Tamiz's father. This novel of epic proportion is populated by many other characters - Abdul Kader - the educated son of a prosperous farmer who becomes a local leader of the Muslim League, Baikuntha Giri - a grocer who knows all the stories regarding the origin of their village, Phuljaan - a farmer's daughter who transgresses caste barriers to marry the fisherman's son Tamiz, Keramat Ali - a nomadic poet-singer and many more.

The 'confrontation' here is not merely the clash of an alien modernity with a pre-modern community since both the forces of modernity and the community that gets worked upon are equally volatile and ambiguous. Elias gives a complex view of the political reality of the East Bengal of 1940s with various political forces conflating and congealing with each other, toying with the same symbols of identity and freedom. It seems that each social class has a different perception about the yet unborn Pakistan. For Tamiz it is the image of a piece of land owned and tilled by him, for the fishermen

living around ‘Katiahar’ - the large water-body owned by the local landlord Sharafat Mandal, Pakistan has no other meaning but the ownership of their source of livelihood, for Sharafat himself Pakistan is the social licence for him to be inducted into the higher echelons of society. The same holds true for the Hindus of that region. Even in the face of the consolidation of a communal Hindu political rhetoric and sharpening of the communal divide, people like Baikuntha Giri are not able to combine this imposed identity and their fluidity of lineage which is a joint inheritance - of stories, of history, of dreams.

The difference is ultimately one of temporal imagination - the multiplicitous reality of co-existence being codified into the norms of a singular and unique identity formation.

According to Benedict Anderson, the ‘modern’ imaginings of communities are produced by the conflict between two kinds of seriality - the seriality of universals and the seriality of governmentality (Anderson, 360). The birth of the nation takes place through strategic distancing of these two serialities and the hegemonic privileging of one over the other. But the world of *Khwabnama* shows the fissures within this oppositional model. Here both the serialities draw strength from the same symbolic order of a shared language. It also challenges the linear journey of history by stretching the temporal parametres beyond the limits of historical documentation into those twilight zones where history and narrative run into each other through very porous boundaries. Elias goes on to show how the Grand Narrative of the genesis of the nation tries to either appropriate or erase the local genesis stories of places like the Nijagirirdanga. The story of the Pakur tree by the side of Katlahar goes back to the rebellion of Maznu Shah - a revered fakir of the region - against the British. Maznu Shah had two trusted generals - Munshi Barkatullah Shah and Bhawani Pathak. When the Munshi was fleeing from the British, he was hit by a bullet and fell from his horse near Katlahar. After his death he climbed up the Pakur tree and has been residing there as a *jinh* since then - “From then on he is spread all over the pond like light within the light of the day” (Elias, 334, translation mine). Bhawani Pathak has another water-body named after him - he still lives in the songs of the local fakirs. One cannot but remember that the same sanyasi rebellion constitutes the historical core of Bankim chandra Chattopadhyay’s Anandamath (1882). The same Bhawani Pathak is an important character of Bankim’s Devi Chaudhurani (1884). But both these texts are silent about the rebel fakirs. By placing the historical view-finder in the popular narratives of sanyasi and fakir rebellions, Elias invokes a certain continuity of collective experience. It also overturns the compartmentalization of time, resulting into the conflation of serialities that Anderson talks about, challenging the discursive stability of the nation.

The Grand Narrative of the nation, though tries to overcome these smaller stories, it cannot quite overwrite them. They come back as living-memory in the countless renarrations within the community. This pattern of continuity and disruption adds a mythic scope to the novel. According to Jean Luc Nancy, “Myth is of and from the origin,

it relates back to a mythic foundation, and through this relation it founds itself (a consciousness, a people, a narrative). It is this foundation that we know to be mythic" (Nancy, 45). Thus myth in its body carries the mark of its own becoming. Elias, by taking recourse to a mythopoeic vision tries to extract the metanarrative of becoming from the tyranny of being. The conception of modernity often defines itself as a turn from the time of the myth to the time of production. But in *Khwabnama*, these two seamlessly flow into each other. Tamiz's efforts to move away from his communal identity as a fisherman to become a farmer are attempts to locate himself within the time of production. At the same time his mental world is consistently haunted by the mythic world of his father. That is why, even after his father's death, Tamiz is followed by his apparition. Tamiz's father on the other hand is a completely mythic being - the carrier of the voice of the fakir Chirag Ali and the Munshi himself. He is the chief custodian of that "anonymous great voice" (Nancy, 45), yet he is not the sole proprietor. His knowledge is shared by the community through the songs of Chirag Ali - songs that he used to claim were not created by him, they were as if knotted within his voice. That voice reverberates through many oral recantations; it is as much of a disembodied omnipresence as Munshi's jinh.

The process of mythation, as Nancy points out, is self-referential. However, at the very moment when myth recognizes its mythicality, its ubiquity as the foundational logos is "interrupted" by what Schlegel calls 'new mythology' (Nancy, 52-53) - new 'fictions' that explode within the mythic body. In *Khwabnama*, one mode of 'interruption' comes from outside - through the competitive communal re-interpretations of myths. The Hindu nayeb and other Hindu leaders try to appropriate the story of a local fair - namely 'sanyasir mela'. While the people of Nijagirirdanga know it to be named after Bhawani Pathak, this new story names it after Ma Bhawani, which is Durga, the wife of Shiva. However, in doing so, it tries to replace one logos with another, perpetrating another, more programmatic tautology. The more important poetic interruption comes from within the community - in the form of the poet-singer Keramat Ali. Keramat is a part of the oral performance tradition of Chirag Ali fakir, and yet by making authorial claims to his own songs he simultaneously disowns and reinvents the tradition he belongs to. He has become a recognizable name by singing political songs espousing the cause of Tebhaga - the movement to recognize the rights of the tillers of the land over three-fourth of its produce. He writes songs while the fakir used to only 'get' them, yet this authorship is not located in the individual since he needs the inspiration of the voice of the fakir. When he is asked to write songs about Pakistan, he does not succeed because he cannot inscribe it in his inherited legacy. Yet he is not satisfied with the disembodied nature of that legacy either, his inspiration needs a much more proximal, sensual touchstone - and thus he comes back to Kulsum again and again, her body the sacred scripture of the unwritten signs of fakir's book.

Khwabnama essentially consists of people in the process of searching - Tamiz, Keramat, Kulsum, Phuljaan - all of them are standing at the breakdown of the symbolic

order where their received meanings have become empty signs. Ironically, they are not alone in this lonely search. Shibaji Bandyopadhyay places them in the company of Dhondai, the protagonist of Satinath Bhaduri's Dhondai Charita Manas (1949-51) and Bagharu, the hero of Debesh Roy's Teesta Parer Brittanto (1990). All of them stand, "in a space without any signpost - they do not find answers anywhere, no signs, no direction of the road...." (Bandyopadhyay, 18, translation mine). This all-engulfing nothingness is their moment of transformation where their received frame falls short of explaining their existence. At this crisis, they have to transform the frame, coax it into yielding hitherto unrecognized meanings. In *Khwabnama*, 'khwab' or dream is the medium of not only new trance-formation but also transgression of the symbolic order. It is also the space where one can locate the entire narrative. In the very beginning of the novel Elias warns his reader, "that space should be carefully looked at" (Elias, 333, translation mine) - that space where we first see Tamiz's father, almost rooted in mud, looking at dark clouds. Space itself here is not a timeless continuity; it has layers that keep piling up. The narrative of the space that has been castigated outside the time of the real can only be recovered in the language of dreams.

At the same time, the category of dream should not be seen as an epistemic legitimation of a phantasmagoric inner world inert to the changes of the physical location of the novel. On the contrary, Shibaji Bandyopadhyay points out that it is the 'present' with all its circumstantial thickness that serves as the metaphysical axis of this novel (Bandyopadhyay, 149). The community of dreamers in Khwabnama obstinately look for their own present becoming - materializing through them and yet mostly unaccounted for. They look for entry-points into history; in doing so often the chief markers of their dream world are also re-examined. So the very existence of Munshi's tree which is the living breathing nerve-centre of their world becomes uncertain. When all of a sudden Tamiz's father who could once reach the tree even in his sleep cannot find it any more, Sharafat Mandal blatantly asks - "Was it ever there ?" (Elias, 519, translation mine). The labourers who have been measuring the pond also confirm that they have not seen any tree nearby. Tamiz's father keeps up with his search and finally drowns himself in quicksand near the pond. Does this quicksand signify the end of meaning or is it the channel that would finally connect Tamiz's clan with the history of their own present ? Keramat Ali's dreams are haunted by the grotesque image of the disfigured breasts of his beloved. In near future Keramat himself would be held responsible for the murder and disfigurement of Kulsum. Should Kumsum's mutilated body be read only as the metaphor of Partition or as the sign of a ravaged, fragmented, dismembered 'present', always in excess of the settled contours of written history ?

The political project of post-colonialism usually defines itself solely vis-a-vis the position and disposition of the colonizer. It locates the sites of resistance against the colonial administrative or cultural mechanisms taking the experience of colonialism as the logos. The nation is important as a discursive unit in so far as it satiates the need

for alternative identity formation as opposed to the colonial Grand Narrative. However, the novels of Elias stand as paradigmatic critique of post-colonialism both in terms of its political as well as discursive orientation. Karl Marx had warned as early as 1945, "The main defect of all hitherto-existing materialism – that of Feuerbach included – is that the Object, actuality, sensuousness, are conceived only in the form of the object, or of contemplation, but not as human sensuous activity" (Marx, 3). From his earlier novel Chilekothar Sepai (The Soldier in an Attic) to Khwabnama, Elias's characters conjure up the history of 'human sensuous activity' that stares back at the originary history of the nation, catching it unaware, unsettling the tragility of the 'in-sufficient' national imaginary. They are not part of either the colonial Grand Narrative or of the nationalist one. These characters and their stories subvert the formulaic narrative of the nation-state exemplified by the words of Salman Rushdie offering a clinical interpretation not only of Partition but also of the historical processes of consolidation and disintegration of communities. These novels open up voices carrying shrieks and silences, marking the sub-continental history to be an ambivalent lineage of sharing and secession, both perversely incomplete. Through people like Tamiz, Phuljaan and their daughter Sakina one encounters the unwritten history of 'returning migrants' - returning not from exile but from erasure, not questioning the sufficiency of the imagination of the nation that has been thrust upon them, but the validity of it.

Works cited :

Anderson, Benedict. *The Spectre of Comparisons : Nationalism, Southeast Asia and the World.* London: Verso, 1998.

Bandyopadhyay, Shibaji. *Bangla Upanyashe* "Ora". Kolkata: Papyrus, 1996.

Chakraborty, Dipesh. *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies.* New Delhi: Permanent Black, 2002.

De Certeau, Michel. *The Writing of History* Trans. Tom Conley, New York: Columbia University Press, 1988.

Elias, Akhteruzzaman. *Akhteruzzaman Elias: Rachana-Samagra 2.* Dhaka: Maola Brothers, 2001.

Marx, Karl. *Marx/Engels Collected Works: Volume V. Moscow:* Progress Publishers, 1975.

Nancy, Jean-Luc. *The Inoperative Community.* Trans. Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland and Simona Sawhney, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Rushdie, Salman. *Shame, New York: Alfred Knopf, 1983.*

W. W. F. – The Ferocious Fun

Abhijit Mondal
Dept. of Maths

It was a very difficult task for me to decide on a topic to write on, but at last I have got it. It is based on wrestling.

If we cast our glance towards ancient Greece, we can see that people were entertained by 'wrestling'. Whenever any war was won, the prisoners became their slaves. They forced them to fight against mad or wild bullocks, elephants, yaks and other ferocious animals. The game continued till one was dead.

In the modern era we proclaim that we are the messengers of peace. We say, we need peace, not war. But such cruelty, is still happening in the name of entertainment. When we watch the television, we watch the display of cruel fun in some sports channel. The game is named W. W. F. (World Wrestling Fecleration). But the name is recently changed. Now it is named W. W. E. (World Wrestling Entertainment). There are some professional wrestlers who usually fight against their antagonists. Some of the names are 'The Rock', 'Undertaker', 'Kane', 'Brock Tesuer', 'Booker – T', 'Rey Mysterio', 'H.H.H', 'Edge', 'Christian' and others. It is very amazing that there are some female wrestlers named 'Jazz', 'Victoria', 'Trish Status' and some others. W.W.F. is nothing but medieval barbarism. This kind of meaningless entertainment has adverse effects on the young mind. Today a boy of ten or twelve does not think twice to break the leg of a classmate or to give him a heavy blow on his face on a very minor issue. This kind of ferocious fun continues unmonitored. I think if this goes on, then juvenile crime will pose more danger than one can imagine.

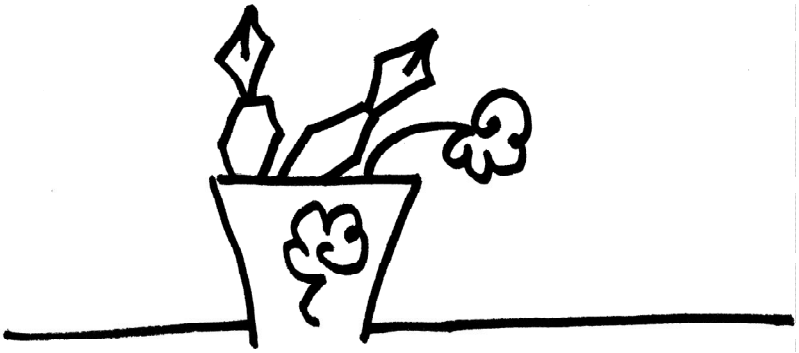

The Genesis of Pen

Aindrila Chowdhury
Dept. of English

Paper and pen are made for each other. But I will discuss here only about 'Pen' which has a distinct history.

Since 'Man' had no idea about how to read and write, they communicated by using body language initially. Then came the use of bones and stone-sticks to write on cave-walls which was a part of 'Cave Culture'. The Chinese men used brush to write on mud-slates at early stages. This style was also in vogue in Egypt at the same time. After some time the Egyptian men began to use inonsticks, wood sticks or elephant teeth instead of brush. But their change brought them closer to invention of pen. The shape of this kind of pen was something like the English alphabet 'V'. It was called 'System'. They were also used in Rome and Greece; the ones which were used for royal cause were made of silver.

With time, pens processed from bird feathers became popular. The process too was simple. Businessmen took it as their business and common people adopted it as their writing equipment. The tip of these feathers were made so fine and sharp that people could easily write on bather with those pen.

The Bengali synonym of 'Pen' – "Kalam" is borrowed from Greek word 'Kalamus' which itself is a metamorphosed word from Arabic. This 'Kalamus' was processed from reeds to write on 'Papirus'. Though it was a synonym of 'Pen', it was more like a brush rather than 'Pen'.

The English word 'Pen' came from Latin word 'Penna' which means 'Bird Feathers'. Mostly feathers of duck, peacock and crow were used for making these pens.

It was a very good business (during 1300-1400 A.D.) to sell these bird feathers in Poland, Germany and Russia (Soviet Union). The merchants got about 10-15 usable

feathers from each of those birds. The use of pen was a very expensive affair at that time.

In 1803, an English inventor made a steel bodied ‘Ready to use’ pen. After ten years its price fell. Though it was invented earlier and it became affordable after some time, it took almost 30 years to become popular. Some rich and famous people began to use those pens after 1830. Some of them were very influential people like Sir Lossef Gille (inventor of ready to use razors), Jessia McGain (a well known politician), James Perry (famous expiditioner) etc.

The close rival, ‘Fountain Pen’ was invented in 1850 by J. Fountain and it easily won the hearts of the common people as it was cheaper than the previously used ‘Luxury Pens’.

In 1940, people got the taste of the first modern writing equipment as ‘Ball Pen’ or ‘Dot Pen’. Even today its popularity has not decreased. It was comparatively more user friendly than fountain pen. It took some time to fill up fountain pens and many drawbacks were faced because its ink took time to dry. As the ball pens were ready to use, it was welcome by all. And top of all, its cost was as cheap as any common household thing.

Though pen was invented a long time ago, it took some time to go through the tough phases of time to be ‘ready to be used’ easily. That’s why ‘Pen’ is so distinct in Modern History.

Indian Economy in the Face of Global Financial Crisis

Rupa Thakur
Dept. of Commerce

Recent global financial turmoil has cast an ominous shadow over the financial environment of all the countries of the world. A question now hovers over the minds of economists and policy planners: will the present global near-depression situation put an end to laissez-faire Raj ?

One school of thought believes that the present world economic crisis is the resultant effect of globalisation-cum-liberalisation policy. Recent negative developments experienced by the western capitalist economies prove that the socalled free market economy can not maximise human welfare and can lead to the establishment of a just society. Contrary to this, there is dismal procession fo financial collapses, insolvencies leading to wide spread unemployment, miseries and despair.

With the dawn of the 90's Indian economy was plagued with unprecedented balance of payments crisis. Our foreign exchange reserve became meagre, the hydra-headed monster of inflation raised its ugly head and the Indian economy stood on the brink of stagnation. The Nehruvian model of planned economic development was considered ineffective to pull the economy from the low level of equilibrium-trap. The Indian policy planners had on other alternative but to embrace full scale globalisation for economic revival of the country. The main mantra nurtured by the government was – 'Private Sector is the King, Private sector can not do any wrong.'

With globalisation spreading its splendid wings in India, GDP growth had crossed 9 per cent in 2007. India's stock markets were booming and a booming stock market is said to be synonymous with national prosperity. Foreign exchange reserve had touched $120 million. The Government became complacent with the 'strong fundamentals' of the economy although critics argued that 'Indian shining had happened in urban India, India whining happened in rural India.' Truely, our economist Prime Minister failed to establish 'inclusive growth' in India.

However, all the gains derived from so-called globalisation-cum-liberalisation were short-lived. With the onset of the global economic slowdown, Indian economy is at the start of a rapidly spreading severe economic crisis. Our exports and industrial production have started declining. Our economy is plagued with growing lay-offs, the falling rupee and falling expectations. The only silver-lining is that the crisis is mainly confined to industry and finance. Besides, the fundamentals of India economy are really very strong

and it is also true that India is one of the least globalised economies among the emerging markets.

At this critical juncture, it appears that the mantra of nationalising the Indian economy will offer a better solution to overcome the crisis. Although inefficiency and corruption prevail across the nationalised sector of our economy, the fact is that people's assets are in relatively safer hands in a non-globalised economy. Besides, the present global slowdown bears testimony to the fact that markets can not offer panacea for every economic ill.

The world today has witnessed a clear picture emerged out of the global financial crisis – "a ceremonial burial of the doctrine of Laissez-faire" and a magnificient come-back of the 'command economy'. All the major industrial countries of the world affected by the current global recession have announced large 'Fiscal Stimulus package' to fight out the crisis. Indeed, the global recession has contributed to a major revival of Keynesianism'. Keynesian prescription during the great depression of 1929 was monetary vis-a-vis fiscal policy to root out the crisis.

Honouring Keynesian philosophy, Indian policy-planners adopted both monetary and fiscal policy to combat the slowdown. Initially, R.B.I. took resort to easy monetary policy to infuse more liquidity into the system through aggressive reduction in key policy rates. The repo rate has been trimmed to 5.5 per cent and C.R.R. to 5 per cent to help revive demand in the economy. Then came the Prime Minister's 'Fiscal Stimulus Package' with the twin objective of boosting aggregrate demand and providing incentive to the manufacturers.

The Prime Minister's fiscal package has provided for faster spending and more funds for infrastructure. But the Government machinary must be greared up for proper implementation of the Public investment programmes. In India, what had happened in the past and what is still happening at present is that public expenditures and social support programms are bogged down by bureaucratic delays, corruption from top to bottom and inefficiencies. All these maladies prevent creation of assets, incomes and jobs that could stimulate the economy.

In view of the global demand slowdown Indian Policy Planners should not forget that India still lives in villages and India's vast rural population will prove to be an asset rather than liability if agricultural sector is dynamised and revitalised by boldly and properly implementing social support programmes and capital creation works in rural India.

Another important policy prescription in the face of present recession in India should be small sector restructuring which would go a long way in absorbing our reserve army of unemployed labours. Small is still beautiful in India.

Global Warming

Atanu Bhanja Chowdhury
Dept. of History

Global warming is the increase in the average measured emperature of the Earth's near-surface air and oceans since the mid 20th century, and its projected continuation.

The average global air temperature near the Earth's surface increased to 0.74^{0}C (1.33^{0}F) during the 100 years ending in 2005. **The Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC)**(1) concludes "most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-twentieth century is very likely due to the observed increase in anthropogenic (man-made) green house gas concentrations" via an enhanced greenhouse effect. Natural phenomena such as solar variation combined with volcanoes probably had a small warming effect from pre-industrial times to 1950 and a small cooling effect from 1950 onwards.

These basic conclusions have been endorsed by at least 30 scientific societies and academies of science including all of the national academies of science of the major industrialized countries. While individual scientists have voiced disagreement with some findings of the IPCC, the overwhelming majority of scientists working on climate change agree with the IPCC's main conclusions.

Climate model projections summarized by the IPCC indicate that average global surface temperature will most likely rise a further 1.1 to 6.4^{0}C (2.0 to 11.5^{0}F) during the 21st century. This range of values results from the use of different scenarios of future greenhouse gas emissions as well as models with differing climate sensitivity. Although most studies focus on the period upto 2100, warming and sea level rise are expected to continue for more than a thousand years even it greenhouse gas levels are stabilized. The delay in reaching equilibrium is a result of the large heat capacity of the oceans.

Increasing global temperature is expected to cause sea levels to rise, an increase in the intensity of extreme weather events, and significant changes of the amount and pattern of precipitation, likely leading to an expanse of tropical areas and increased pace of desertification. Other expected effects of global warming include changes in agricultural yields, modifications of trade routes, glacier retreat, species extinctions and increase in the ranges of diseases.

Remaining scientific uncertainties include the amount of warming expected in the future, and how warming and related changes will vary from region to region around the globe. Most national governments have signed and ratified the **KYOTO PROTOCOL**(2)

aimed at reducing greenhouse gas emissions, but there is ongoing political and public debate worldwide regarding what, if any, action should be taken to reduce or reverse future warming or to adapt to its expected consequences.

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is a scientific body tasked to evaluate the risk of climate change caused by human activity. The panel was established in 1988 by the World Meteorological Organisation (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), two organisations of the United Nations. The IPCC shared the 2007 Nobel Peace Prize with former Vice President of the United States, Al Gore.

The IPCC does not carry out research, nor does it monitor climate or related phenomena. The main activities of IPCC are publishing special reports on topics relevant to the implementation of the UN Framework on Convention on Climate Change (UNFCCC), an international treaty that acknowledges the possibility of harmful climate change, implementation of the UNFCCC led eventually to the Kyoto Protocol. The IPCC bases its assessment mainly on peer reviewed and published scientific literature. The IPCC is only open to member states of the WMO and UNEP. IPCC reports are widely cited in almost any debate related to climate change. National and international responses to climate change generally regard the UN climate panel as authoritative.

2. Kyoto Protocol

The Kyoto Protocol is a protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) with the objective of reducing greenhouse gases in an effort to prevent anthropogenic climate change.

It was adopted on 11th December, 1997 by the 3rd Conference of the parties, which met in Kyoto, and it was enforced on 16th February 2005, as of May 2008. 182 parties have ratified the protocol. Of these, 36 developed countries are required to reduce greenhouse gas emissions to the levels specified for each of them in the treaty (representing over 61.6% of emissions from Annex I countries), with three more countries intending to participate. One hundred and thirty seven (137) developing countries have ratified the protocol, including Brazil, China and India, but have no obligation beyond monitoring and reporting emissions. The United States is the only developed country that has not ratified the treaty and is one of the significant greenhouse gas emitters. Among various experts, scientists, and critics, there is debate about the usefulness of the protocol, and there cost benefit studies have been performed on its usefulness.

Role – Reversal

Pratyay Ghorai
Dept. of English

Big names – people who have made it to the top, are admired by all around them. The latter dream to achieve the kind of success that the former has achieved. After all, only one in a million can achieve the kind of glory and glamour that surround Lakshmi Niwas Mittal, Shahrukh Khan or Roger Federer. However, if one has the freedom to imagine that he or she is a superstar and given a chance, I would like to become Mahendra Singh Dhoni for two days!

The name Mahendra sounds pleasant, but more than his name, his surname Dhoni creates sensation in the hearts of the millions of Indians who love cricket. His name grows big every second and so does the huge amount of expectations that people have for him. Being Mahendra Singh Dhoni I would have the world at my feet. I would do wonders with the cricket bat and aim at achieving milestones in international test cricket and one day games. I would become the nightmare of bowlers like Brett Lee, Shoaib Akhtar and Muttaiah Muralitharan. Kids would fall over me for my autograph and I would be the heart throb of the fairer sex. Big corporate gigantic firms like Videocon, Pepsi etc. would chase me for endorsing their products. My hair style would be worth million of dollars and I would get the request by General Parvez Musheraf to keep long locks. I would get a chance to act in a popular show like 'Chak De Yaara' with King Khan and say dialogues like 'Dhoni Ko Pakarna Mushkil Hi Nahi Namumkin Hai'. I would be the most valuable player of the IPL (Indian Premier League) and my value would be 1.5 million dollars. I would captain the Indian Cricket Team with a positive frame of mind and marshall my resources so well that I will make my country and my native state Jharkhand proud by winning series like the inaugral T20 World Cup in South Africa and Common wealth Bank Series in Australia. To the team my commitment given will always be 100% and I will win matches for India within minutes by snatching victory from the jaws of defeat. I would be honoured by receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award from the Government of India. I would be fortunate to have great friends like Yuvi (Yuvaraj Singh), Rohit (Rohit Sharma), Sree (Santha Kumaran Sreesanth), Irfan (Irfan Pathan) and Bhajji (Harbhajan Singh) with out whom I could not have tasted success and glory which I have achieved today. More than friendship I will share fraternity with them. I would have luxury cars like Mercedes, BMW, Honda and Skoda. I would be able to wear fashionable apparels like Allen Solly, Provogue, Levi's and Blackberry's. I would of course frequently visit foreign countries like France, Austria, Singapore, England, New

Zealand, Italy and most importantly the play ground of Europe i.e., Switzerland. My surname Dhoni can be deconstructed as D for Dynamic, H for Honest, O for Original, N for Nobel and I for Intelligent. I would be one of the most eligible bachelors of the world. But while I plan so many things, I have to remember that I can be Mahendra Singh Dhoni only for a couple of days and to materialise so many dreams within so short a period of time is difficult. I would have to be satisfied with the thought that I am an icon, one of the most loved and successful persons on earth and cynosure of the eyes of the millions of cricket lovers of India. There would perhaps be no time for a trip to Switzerland or Italy but the possibility of thrashing either the 'Rawalpindi Express' (Shoaib Akhtar), Leethal Lee (Brett Lee) or the 'Mesmerising Turner of the Ball' (Muttaiah Muralitharan), giving away autographs, driving a BMW and modelling for 'Pepsi' for a huge sum of money cannot be ruled out.

But it is to be remembered that what M.S. Dhoni has achieved is because of sheer hard work and immense talent. To dream about sharing his success or becoming like him is as easy as selling peas but in reality coming anywhere near Mahendra Singh Dhoni's calibre and greatness is nobody's cup of tea.

Of Her Disobedience

Dibyendu Sardar
Dept. of Education

Few months back I casually asked one of my friends to give me a book just to read or candidly speaking to kill that unexplainable boredom that just comes and goes without any rhyme or reason. She gave me *Not Without My Daughter* by Betty Mahmoody and William Hoffer. I started reading the book thinking it will be one of those filial stories. It was not my prejudice but I just assumed knowing fully that male that assumptions have a fair chance of going wrong. So that I won't feel guilty neither I expect some thing when I start to read anything as I know my flights of expectation will take some time to engulf everything and for 'expectation/-s' .....even sky is not the limit!

Not Without My Daughter (fiction, biography) published in 1988 is about those women who are forced to stay in foreign lands against their will but Betty is an exception. Betty is a woman who is approaching middle age with two young sons from a previous marriage who when we meet her is on her way to Iran with her second husband and their young daughter (Mahtob) for a short holiday "Moody" is an Iranian doctor living in America with his American wife "Betty" and their child "Mahtob". Wanting to see his homeland again, he convinces his wife to take a short holiday there with him and Mahtob. Betty is reluctant, as Iran is not a pleasant place, especially if you are American and female. Upon arrival in Iran, it appears that her worst fears are realized her husband undergoes a sudden transformation in Iran, becoming increasingly domineering, abersine, and virtually imprisoning Betty and eventually deciding that they will not return to the Unites States. Betty is told that she can leave, but their daughter must stay in Tehran. What was supposed to be a two week trip lasted as eighteen months ordeal. Betty is determined to escape from Iran, but taking her daughter with her presents a larger problem. Ultimately, after eighteen months in Iran, Betty and her daughter return to their homeland.

The descriptions of the place, people, surrounding and the plight of a woman in a patriarchal society governed as much by religion as the country's leaders and who is caught in this helpless situation is what makes this book worth a reading or re-reading! It's not that Betty disliked Iran before she arrived but her disliking got deep-rooted when she set her foot in this country with her family. All of a sudden her husband seemed a complete stranger in a strange land amidst strong people. Her efforts to elope from Iran and contacting the Iranians whom she doesn't know, taking the risk always just for her sake, her daughter and her ailing father who wants to see both of them before dying

will make you extend a helping hand to this lady. There are moments in the book where I've felt the pain and the pinch ..... always thinking how many of us had an iota of courage to fight the injustice like Betty. Even if many does most of the times the words fail to meet the daylight of action. The escape from Iran to Turkey on land in a bewildering snowstorm will send shiver down your spine.

I know that many of us while reading this would think that these stories are similar and often heard. But if you read the book what is to be underlined is the honesty with which Betty narrates her own story or shall I say nightmare of her life! I like reading this book not because there is a thrill and heroism attached with the actions taken by the protagonist but mainly due to the efforts that Betty takes and her optimism which multiplies day in and day out and shuns the value of courage, love and faith in rescuing herself & her daughter. Although the book was written and published in late 80's of the last century, the oversees in the relation between Iran and America is still there and U.S. backing Iraq in war and not Iran is a valid example.

Obviously this book and film is somewhat anti-Muslim in tone. But if Betty's story is true and there are others like her still held against their will, then that story is worth telling. In case if any one of you are wondering what happened to Betty and Mahtob after they returned America – both of them are living under assumed names in an undisclosed location – somewhere in America. What happened to Dr. Mahmoody in Iran is not very clear. Also after reading this if anyone of you are interested in glancing through the book, I would be more than glad to share my copy with you!

स्मृतियाँ

मो॰ तोसीफ खान
राष्ट्रविज्ञान विभाग

सभी इंसान के मन में इच्छा होती है कि वह कहीं न कही जाए। कोई सुन्दर प्राकृतिक शोभा युक्त स्थान पर जाना चाहता है तो कोई विदेश यात्रा करना चाहता है। कुछ लोग तो चांद पर या अंतरिक्ष पर जाने की इच्छा रखते है। यदि मुझसे पूछा जाए कि मै कहां जाना चाहती हूँ तो मेरा उत्तर होगा गुवाहाटी। मै गुवाहाटी जाना चाहती हूं, गुवाहाटी – जहां मेरा बचपन बीता। जिस जगह से मेरी हजारों स्मृतियां जुड़ी हुई है, वहाँ मै एक बार जाना चाहती हूँ। उस घर को, उस जगह को एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। लोग कहेंगे गुवाहाटी ? वहां जाना कौन सा कठिन है। रोज कोलकाता से कई ट्रेने छूटती है। हवाईजहाज जाती है। ट्रेन से एक दिन में और फ्लाईट्स से तो एक घंटे में पहुंचा जा सकता है। फिर अपने देश के भीतर ही है। अब तक कोई कठिनाई नहीं है वहां पहुचने में। यह सब सही है, लेकिन फिर भी 1987 में वहां से कोलकाता आने के बाद से आज तक मेरी प्रबल इच्छा होते हुए भी वहाँ जाना नहीं हो पाया। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द गुवाहाटी जाऊँ अपने परिवार के साथ। मै देखना चाहती हूँ वह घर कैसा है जहां हम रहते थे, वह आस पड़ोस, हमारा वह बगीचा, वह परिवेश। कितना बदलाव आया होगा इन सबमें ? आज भी वह सारा माहौल मेरे आंखों के सामने घूमता है, मै इन सबको महसूस कर सकती हूँ। जब भी सुनती हूँ कि कोई गुवाहाटी से घूम आया है या गुवाहाटी से आया है तो उसे देखकर अजीब सा रोमांच होता है। मैं उसे देखती ही रहती हूँ। क्यूंकि हमारा क्वाटर एयरपोर्ट से शहर की ओर जानेवाले रास्ते के किनारे है तो यह निश्चित है कि यदि कोई फ्लाईट से जाता है तो शहर जाने के लिए हमारे क्वाटर के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। मै उसे देखती हूँ और सोचती हूँ कि यह उसी जगह से गुजरकर आया है जहाँ जाने के सपने मै देखती हूँ। कितना भाग्यशाली है यह। और भी पता नहीं क्या क्या।

गुवाहाटी में मै काफी दिनों तक थी। मेरा बचपन वहीं बीता। मेरे पिताजी एयरपोर्ट में नौकरी करते थे। अतः हम एयरपोर्ट के नजदीक क्वाटर में रहते थे। बड़ा सा फैला हुआ घर और उससे भी आकर्षक विशाल बगीचा जिसमें

मेरे पिताजी तरह तरह के सब्जियाँ उगाते थे। आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, लॉकी, सरसों और न जाने क्या क्या। हम भी सारा दिन बगीचे में पेड़ पौधो के बीच घूमते रहते। हर महीने कॉलेज स्ट्रीट से बागवानी पर किताब जाती थी पिताजी के पास। हमारे बगीचे का मूल आकर्षण बगीचे के कोने में लगा सजहन का पेड़ था। विशाल पेड़। जब सजहन के फूल लगते थे नीचे सफेद चादर बिछ जाती थी। हम उसे चुनते थे। सजहन की पतली-पतली लकड़ियों को इकट्ठा करते, उनसे आग जलाते और तापते। छोटे छोटे लाल लाल सजहन से लेकर परिपुष्ट सजहन-सब हम खुद खाते, सारे मुहल्ले में बाँटते, फिर भी खत्म न होता। हम यानि मै और मेरी दीदी स्कूल से आते ही बगीचे में घूमने लगते। कभी पेड़ों में पानी देते, कभी सब्जियों को देखते कि कितना बड़ा हुआ तो कभी फूल के पौधे लगाते। मेरी छोटी बहन भी हमारे पीछे-पीछे घूमती। हमारे बगीचे में एक बकरी आती थी घास चरने। हम बहन को उस पर बैठा कर घूमाते। बगीचे के एक कोने में एक करी पत्ते का पेड़ था जिस पर बाँसे बांधकर पिताजी ने खड़े होने की जगह बना दी थी। उस पर चढ़कर मै पीछे मैदान में सेना के जवानों के पैरड की प्रैक्टिस होते हुए देखती। उसका अलग ही मजा था। मम्मी दोपहर को आंटी के साथ बैठकर सर्दी की धूप में स्वेटर बुनती। उनके साथ-साथ मै भी गुड़िया का स्वेटर वगैरह बनाती। उस छोटी सी उम्र से मै स्वेटर बुनना सीख गई थी जो कि अब भूल गई हूँ।

वहां बाजार थोड़ा दूर था। पिताजी ही ज्यादातर बाजार से सामान लाते थे। कभी कभी मै उनके साथ जाती थी साइकिल पर। पिताजी मुझे टॉफियां खरीद देते।

हमारे घर के नजदीक एक रामकृष्ण आश्रम था जहां पर हम नियमित जाते थे। किसी खास उत्सव पर खिचड़ी प्रसाद मिलता। सब लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते में खाना और फिर घर ले जाना, उसका स्वाद ही अलग था।

मेरे स्कूल घर से थोड़ा दूर था। पहले पिताजी के साइकिल पर जाती थी, बाद मे रिक्शा में। उस स्कूल को भी देखने की इच्छा है। तब तो छोटा सा स्कूल था, अब शायद बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा। रोज शाम को हम खेलने निकलते, मेरी कई सहेलियाँ थी। हम तरह तरह के खेल खेलते। मेरी बहन भी हमारे साथ खेलती। एक चनावाला आता था रोज। उससे हम 10 पैसे के चने खरीदकर खाते। मेरा एक खास पेड़ा था जो मै रोज खाती। पाँच पैसा दाम था। बहुत स्वादिष्ट था।

हम लोग कभी कभी पिकनिक भी करते थे। आस पास की अंटियां और हम बच्चे। मूल सामान हमारे बगीचे से आता था। कभी खिचड़ी पिकनिक तो कभी समोसा पिकनिक। पिकनिक कभी घर पर होता तो कभी बगीचे मे मिट्टी का चूल्हा बनाकर। वह स्वाद और मजा यहाँ कहाँ? वह सब अब केवल स्मृतियाँ बनकर रह गई है। इस तरह की न जाने कितनी छोटी-छोटी घटनाएं है जो मन में है। मै वह सब कुछ फिर से प्रत्यक्ष रूप से महसूस करना चाहती हूँ। वह घर, जहां मै बरसों अपने पिताजी, माँ, दीदी और बहन के साथ रही - उस घर को, उन दीवारों को देखना चाहती हूँ। वह माहौल, वह परिवेश देखना चाहती हूँ। वहां की हवा में उन बीते दिनों की खुशबु मुझे अभी भी मिलेगी। उससे मै अपने पति को परिचित कराना चाहती हूँ। अपने बेटे को उस सुगंध के बीच ले जाना चाहती हूं। मै चाहती हूँ कि वह भी उस माहौल में सांस ले, वह हवा उसमें भी बस जाए जिसकी स्मृतियां मेरे मानस पटल पर न जाने कब से बसी हुई है। मै अपने सपने को एकरूप देने के लिए यथाशीघ्र गुवाहाटी जाना चाहती हूँ। पुराने स्मृतियों की पृष्ठभूमि पर नई अनुभूतियों को पत्रिका के अगले संस्करण के लिए सुरक्षित रखूंगी।

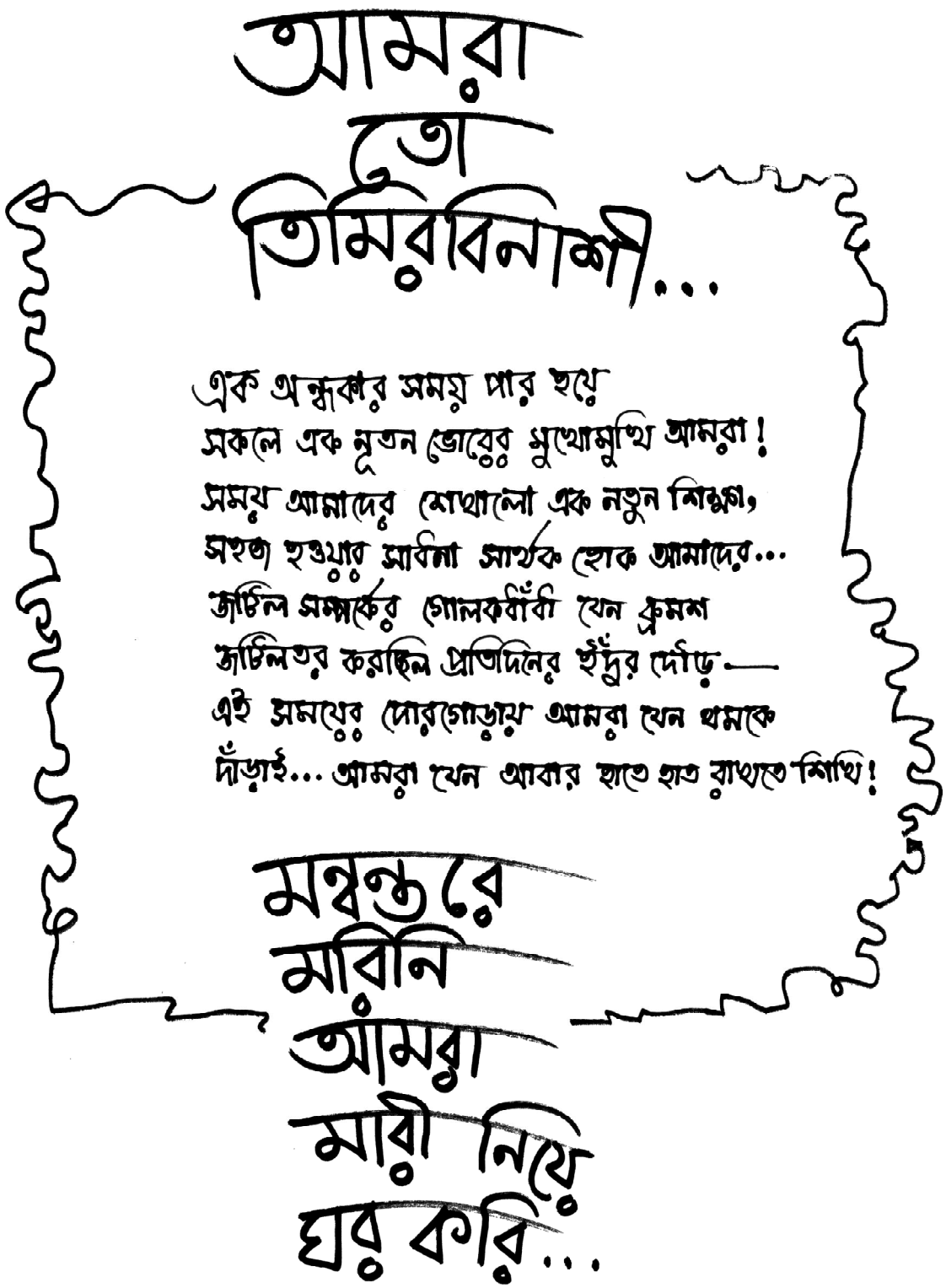

আমরা তো তিমিরবিনাশী...

এক অন্ধকার সময় পার হয়ে
সকলে এক নূতন ভোরের মুখোমুখি আমরা!
সময় আমাদের শেখালো এক নতুন শিক্ষা,
সহজ হওয়ার সাধনা সার্থক হোক আমাদের...
জটিল সম্পর্কের গোলকধাঁধা যেন ক্রমশ
জটিলতর করছিল প্রতিদিনের ইঁদুর দৌড় —
এই সময়ের দোরগোড়ায় আমরা যেন থমকে
দাঁড়াই... আমরা যেন আবার হাতে হাত রাখতে শিখি!

মন্বন্তরে
মরিনি
আমরা
মারী নিয়ে
ঘর করি...

গল্পের পাতা

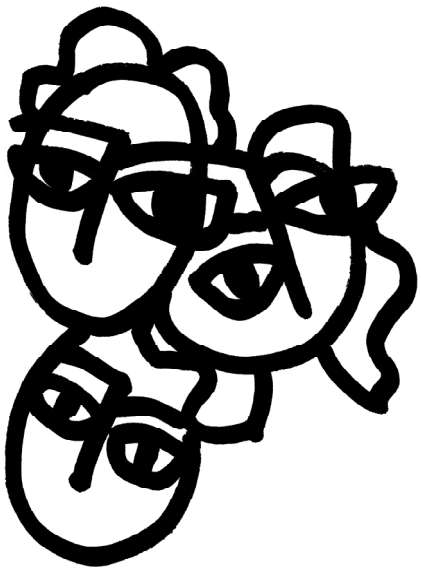

গল্পের পাতা

সরল

কাজল মাইতি
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

— 'বি ও ডি এম এ এস'

— 'বদমাশ'। বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে পিঙ্কু।

শীতের সকাল। জানুয়ারি মাস। সবে মাত্র সকালের কুয়াশা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে। পিঙ্কুর বাবার আজ ছুটি। রোববার তো। তাই সকালে বাবার কাছে অংকের ক্লাস। ক্লাস ফোর চলছে। কদিন বাদেই ফাইভে ওঠার অ্যাডমিশন টেস্ট। আজ তারা সরল শিখছে।

— 'এটা মনে রাখলেই সরলের মত সরল অংক আর দুটো খুঁজে পাবি না, বুঝলি? স্কুলে শেখায়টা কী তোদের? এই ইজি ট্রিক্স্গুলো একটু বলে দিতে পারে না?'

— 'না বাবা, কই অংক স্যার তো এরকম কিছু বলল না....'।

— 'বললেন না'; শুধরে দেন বাবা।

— 'সরি, সরি, বললেন না।'

— 'এই এক শিখেছে কথায় কথায় 'সরি', পাশ থেকে বলে ওঠেন মা, 'এতটুকু বাচ্চাগুলোর কেমন যেন হাবভাব, হাই বাই সরি থ্যাঙ্ক ইউ ছাড়া মুখে কথা নেই। আমরা ছোটবেলায় কত সরল সাদাসিধে ছিলাম না?'

— ''বি ও ডি এম এ এস' - এর মত সরল মা?" পিঙ্কু ভালোমানুষের মত জানতে চায়।

— 'মারব এক থাপ্পড়', কপট রেগে বলেন মা, 'দেখো একবার আদর দিয়ে কেমন বাঁদর করেছ ছেলেটাকে।' শুনে হো হো করে হেসে ওঠেন বাবা। মা কটমট করে তাকান কিন্তু ঠিক সেই সময় ডোরবেলটা বেজে ওঠে। ফলে ছেদ পড়ে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণে।

— 'উফ্ এই ঠাণ্ডার মধ্যে কে আবার.....' বাবার বিস্ময়।

— 'সবার তো আর তোমার মত ঘরে বসে আলসেমি করলে চলে না মশাই। দেখি নতুন কাজের লোক আসার কথা ছিল।' মা দরজা খুলে দিতেই পিঙ্কু পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় রোগা কালো লম্বা মতো একটা 'মেয়েলোক' (মা এদের মেয়েলোকই বলে, মহিলা না), দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ময়লা কাপড়, উঁচু করে পরা, পা-এর গোছ দেখা যাচ্ছে। গা-এ একটা ছেঁড়া পাতলা চাদর মাত্র। দেখেই একবার হিহি করে কেঁপে উঠল পিঙ্কু।

— 'কী চাই?' মা-এর কড়া গলা।

— 'তুমাগো উপর তলায় যে বউটো কাম করে হ্যায় কইল গিয়া তুমরা কাজের লোক খুঁজতে আছ।' বাপরে কি গলা! কি অসভ্যের মত জোরে কথা বলছে — ভাবে পিঙ্কু।

— 'অ্যাই আস্তে, মনা পড়ছে' মা-এর ধমক।

— (গলা নামিয়ে সচেতনভাবে) 'মনা পড়তে আছে? ভালো ভালো পড়ুক।'
— 'আমার কিন্তু সকাল সকাল দরকার। মনার সকালে স্কুল, ওর বাবাও খেয়ে বেরিয়ে যায়। সাড়ে ছ'টার মধ্যে না এলে কিন্তু হবে না, দেখ পারবে?'
— 'আমার হাউড়ি কইত গিয়া, মাইয়া মাইনষেরে সব পারতি হইব। নইলে পোলাপানে দ্যাখব কেডা? কত্তার আছিল আফিমের ন্যাশা। তা ঐ হাউড়িই গায়ে গতরে খাইট্যা ছলগুলারে বড় কইরল। তা মা গো দুইখ্যের কতা কী কইব, সে'বার শেতলা পুজার দিন সে কি রক্তবমি! সব বউ-ঝিরা দৌড়ে আইল, কিন্তু মা শেতলাই নিলে বুড়িরে। তা তহন আবার খোকার বাবা....'
— 'আচ্ছা থাক থাক, ওসব পরে শুনব খন। আগে কোথাও কাজ করেছ?'
— 'মা গো বলি শোনেন, যদিন খোকার বাপ আছিল তদ্দিন মোরে ঘরের বাইর হইতে হয় নাই কখনো। তা গেল বছর জমিতে চাষ করতে আছিল, চোত মাসের দুফুর, বোঝলেন মা, ঝড় ওঠল। সে কি ঝড়! আমাগো দুই ঘর পর এক জেলে বউ আছাড়িবিছাড়ি কান্দে আর কয় — 'সব্বনাশী ঝড় আইল, লোকডা যে আজই বড় গাঙে নাও ভাসাইল গো।' সেই শুইন্যা আমার মাইয়াডার কি কান্না, কয় 'বাবুরে মাঠে ভাত দিতা যাইব ক্যামনে?'
— 'আচ্ছা এবার আমার কথাটা....' মা বলার চেষ্টা করেন।
— 'মা গো বললি পেত্যয় যাবা না, যেই না আমি ভাত গুছোইছি — অমনি একখানা বাজ যা পড়ল! আধা ঘন্টা পার হয় নাই, লোকজন খোকার বাপেরে কান্ধে কইরা লইয়া আইল। দ্যাহে পরাণটুক আর নাই তখন। ওরা কইল বাজে গরুটাও ঝলসাইয়া গিয়াছে।'
— 'তারপর থেকে তুমি কাজ করতে বেরলে, তাই তো? ছেলেমেয়ে কটা তোমার?'
— 'দুইডা, মা গো। মাইয়াডা বড়। খোকারে কষ্টেছিষ্টে ইস্কুলি পাঠাই। আগে আমি কাম করি নাই। মাইয়াডারে দিছিলাম এক বাড়ী।'
— 'কত বড় মেয়ে?'
— 'গেল অঘ্রাণে বারোয় পড়ল। তিন তিনডা প্যাট, আমি ঠোঙা বানাইয়া আর মাইয়ার রোজগারে চলে না। তা মা আমারে রাখেন। ভোর ভোর আইস্যা আপনাগো কাম সাইর‍্যা গিয়া ছল্‌ডারে দুইডা মুড়িচিড়া দিব। পরে ইস্কুলে খিচুড়ি খাইবে।'
— 'দেখ বাপু, ঘর আমার তিনটে, এ বাদে খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘর। ঝাঁট, মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা। টিউবওয়েলের ঝামেলা নেই, আমার বাড়িতে কলের জলেই সব করবে। এবার বল মাইনে কত নেবে? দেখ ঠিকঠাক করে বল, না হলে তোমারও কাজের অভাব হবে না, আমিও লোক পেয়ে যাব।'
পিঙ্কু এবার ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে। মা গরম গরম স্যুপ বানিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু এদের কথা যে আর শেষই হচ্ছে না।
— 'মাইয়াডা যেই বাড়ি কাম করে খাওয়া-পরা ছয়শো টাকা দেয়।'
পিঙ্কু আর থাকতে না পেরে উঠে এসে মা-এর কাছ ঘেঁষটে দাঁড়ায়।
— 'কি সোন্দর খোকা গো তুমার! আমারডা আরও ছোট। মাইয়াডার যে কি মায়া ভাইয়ের উপর। কত কি যে লইয়্যা আসে — বিস্কুট, লজেন, গুঁড়া দুধ, সব কাজের বাড়ি থিক্যা। সেইদিন আবার চাদরের তলে দুইখান থালা-বাটি আনছে দেখি....'

পিঙ্কুর মায়ের মুখটা প্রথমে অবাক, তারপরে কঠিন হয়ে ওঠে ধীরেধীরে। পিঙ্কু লক্ষ্য করে 'মেয়েলোকটা' তখনো হাসি হাসি মুখ করে কীসব বকে চলেছে।

— 'তুমি এখন এস,' বলেন মা, 'পরে খবর দেব।'

— 'কাইল ভোর থিক্যা আসি তাইলে,'

— 'না। বললাম তো খবর দেব।'

এক প্রকার জবরদস্তি তাকে বিদায় করেন পিঙ্কুর মা।

— 'এই ক্লাসটা না সাংঘাতিক।' মা, বাবার দিকে না ফিরেই বলে চলেন, 'আর একটু হলে আস্ত চোর ঢোকাচ্ছিলাম ঘরে। প্রথমে দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে সিমপ্যাথি ড্র করবে তারপর বাড়ি সুদ্ধ লোপাট করে দেবে। মেয়ে ওই হলে মা না জানি কী হবে! যত সব বদমাশের দল' — স্যুপ বানাতে ব্যস্ত হন তিনি।

পিঙ্কু বাবার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে বলে — 'ও কি বোকা না বাবা! বলে দিল ওর মেয়ে চুরি করে!'

পিঙ্কুর অংক বইটা বন্ধ করে পাশে রাখতে রাখতে বাবা বললেন আনমনে, — 'সরল'।

গল্পের পাতা

এক হাজার বছর পর

রেনিকা বিশ্বাস
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

''হ্যারে প্যালা, কাল তোর মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোবে না?'' — রাতের খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞাসা করল প্যালারামের মামা।

''হ্যাঁ'' — একটু থেমে উত্তর দিল প্যালা।

''এবারে পাশ করবি তো?''

''জানি না''।

''জানি না মানে? তিন-তিনবার মাধ্যমিকে ফেল করেছিস। লজ্জা করে না তোর? এখন আবার বলছিস জানি না! এবার যদি পাশ না করিস তো বাড়িতে ঢুকতে দেব না বলে দিচ্ছি।''

খুব রেগে খাবার টেবিল থেকে উঠে গেল প্যালার মামা। প্যালাও ওদিকে আর না খেতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেল। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো সরস্বতী ঠাকুরের ক্যালেন্ডারের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''এবারের মতো পাশ করিয়ে দাও ঠাকুর। আমি কথা দিচ্ছি এবার থেকে পড়াশুনায় মন দেব।''

এভাবে রেজাল্ট বেরানোর কিছুদিন আগের নিত্যকর্ম সেরে শোবার জন্য বিছানায় যেতে গিয়ে দেখল বিছানার ওপর একটা ''আনন্দবাজার পত্রিকা'' পড়ে রয়েছে। আসলে পেপারটা প্যালাই বিকালবেলা এনেছিল রানুর কাছ থেকে। পেপারটা তখন আর দেখা হয়নি। এখন নিয়ে বসল। প্রথমেই নজর পড়ল শেষ পাতার একটি বিজ্ঞাপন — ''বিজ্ঞানীরা একটি টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছে, যার সাহায্যে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করা যাবে। কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য একটা লোক দরকার।' প্যালা ভাবতে লাগল, ''এও আবার সম্ভব?'' পেপারটা বুকের উপর নিয়েই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল প্যালা।

সকালে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল প্যালার। গম্ভীর মুখে উঠে স্নান করে, কিছু খেয়েই বেরিয়ে পড়ল স্কুলের দিকে রেজাল্টের খবর জানতে। সারা রাস্তায় এটা সেটা ভাবতে ভাবতে চলল। হঠাৎ একটা ধাক্কায় হুঁশ ফিরে পেয়ে পিছন ফিরে দেখল শশিনাথ।

''কীরে প্যালা কতবার ডাকলাম শুনতে পাসনি? ওভাবে অন্ধ-কালার মতো রাস্তা হাঁটছিস কেন? কি হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? এবারেও কি ফেল করলি নাকি?''

এভাবে একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে প্যালা হতভম্বের মতো দাড়িয়ে থাকল।

''কীরে, কিছু বলছিস না কেন? কী হয়েছে?''

''কিছু না। স্কুলে যাচ্ছিলাম রেজাল্ট আনতে।''

''ও। রেজাল্ট পাসনি তাহলে এখনও। আমি আবার ভাবলাম.....। ঠিক আছে যা।''

শশিনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে গেল প্যালা। স্কুলের গেটের সামনে এসে বুক টিপ্ টিপ্ অবস্থায় স্কুলে ঢুকল। ভয়ে ভয়ে গেল স্টাফ রুমের দিকে। রেজাল্টে দেখল এবারেও পাশ করেনি। কান্নায় দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আরও বড় ধাক্কা অঙ্কে শূন্য। কী আর করবে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে গেল প্যালা। পথে আবার শশিনাথ। প্যালার কাছ থেকে রেজাল্ট দেখে শশিনাথ চিল্লিয়ে বলতে লাগল, ''শুনছ গো শম্ভু দা-আ-আ-আ। প্যালা অঙ্কে শূন্য পেয়েছে-এ-এ-এ''।

লজ্জায় আর দাড়িয়ে থাকতে না পেরে প্যালা রেজাল্ট নিয়েই সেখান থেকে দৌড় দিল। মনে মনে ভাবল — এখন বাড়ি না গিয়ে কোথা থেকে ঘুরে আসি। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি যাওয়া যাবে।

ভেবে পকেটে হাত দিতেই দেখল কিছু টাকা আর সেই বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা। দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেল সে — ''আশ্চর্য তো! এই ঠিকানাটা আমার কাছে এল কোথা থেকে? যাই হোক বাড়িতে তো ঢুকতে দেবে না। যাই ভবিষ্যৎ থেকেই ঘুরে আসি।''

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে প্যালা যখন বলল সে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছে পরীক্ষা দেবার জন্য, কিছু লোক তাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তার নাম, ঠিকানা নিয়ে একটা কাচের বাক্সে ঢুকিয়ে দিল। বলা বাহুল্য সেটাই টাইম মেশিন। দরজা আটকাবার আগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ''এখনও ভেবে দ্যাখো। একবার গেলে কিন্তু আর ফিরে আসতে পারবে না।''

প্যালা হকচকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''কেন?''

''বা রে ফিরে আসতে পারলে আমরাই ঘুরে আসতে পারতাম না? বিজ্ঞাপন দেবার কী দরকার ছিল?''

প্যালা একটুখানি ভেবে বলল, ''সে-এ-এ ঠিক আছে। বাড়ি গিয়েই বা কী হবে? ঢুকতে তো পারবো না। তার থেকে বরং ভবিষ্যতেই গিয়ে কাজ করে খাব।''

প্যালার কথা শুনে বিজ্ঞানীটি দরজা বন্ধ করে টাইম সেট করল 25th April, 3009 টাইম দেখে চমকে উঠল প্যালা, ''বাপ্‌রে, পুরো এ-এ-এক হাজার বছর!''

টাইম মেশিন চালু হলে প্যালা দেখল চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। ভয় পেয়ে টাইম মেশিনের দরজা খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে চারিদিক পরিষ্কার হতে লাগল। টাইম মেশিন থেকে বেরিয়ে প্যালা তো অবাক হয়ে গেল।

''কী ব্যপার! একটু আগেই যে কতগুলো সব বুড়ো বুড়ো লোক আমাকে ঘিরে দাড়িয়ে ছিল। গেল কোথায় সব?

কিছুক্ষণ পর প্যালা বুঝতে পারলো।

''আরে, সে সব লোকতো এক হাজার বছর আগে চলে গেছে।''

হঠাৎ তার নজর পড়ল একটা রোবটের উপর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল একটাও মানুষ কোথাও নেই। সবই রোবট। আর চারিদিকে বড় বড় সব মেশিন। পুরো ঘরটাই কাঁচের। এক হাজার বছরের যাত্রায় বেশ খিদেও পেয়েছে প্যালার। ধারে কাছে কিছু খাবারও নেই। একটা রোবটকে জিজ্ঞাসা করল,

''কিছু খাবার দিতে পারবে? খিদে পেয়েছে।''

রোবট যে 'অ্যাঁ' - 'ওঁ' করে কী বলল তা কিছুই মাথায় ঢুকল না প্যালার। অধৈর্য হয়ে প্যালা একটা খাটে গিয়ে বসল। সেখানে গিয়ে মনে হল চেহারাটার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা দেখা যাক। ভেবে সে একটা

বড় আয়নার সামনে গিয়ে দেখে, যা ভেবেছিল ঠিক তাই। অনেক বড় হয়ে গেছে যে। কিন্তু এটা ভেবেও আশ্চর্য হল যে এই এক হাজার বছরে মাত্র এটুকু বড় হল।

কিছুক্ষণ পর বাইরে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বেরোতে গিয়েই ভূত দেখার মত লাফিয়ে পাঁচ পা পিছনে সরে এল।

''বাব্বাঃ। এক হাজার বছরে মানুষ এত উন্নত হয়ে গেছে যে বাড়িটাকে সুদ্ধ হাওয়ায় ভাসিয়ে রেখেছে।''

কী আর করবে। বাইরে তো বেরোনো গেল না। তাই অন্যমনস্ক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ খেয়াল পড়ল আকাশে খুব বেশিই আলো রয়েছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল একটা নয়, তিন তিনটে সূর্য আকাশে রয়েছে। তার মধ্যে একটারই আলোটা একটু কম। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখল একটা বাজার আকাশে ঝুলছে বেলুনের সাহায্যে। আর অনেক লোক এক একটা ছোট ছোট প্লেন নিয়ে বাজার করতেও যাচ্ছে। ঠিক যেন এক একটা মোটর বাইক। হঠাৎ তার সামনে থেকে একটা বড়ো মাপের প্লেনে কন্ডাকটর চিৎকার করে যাচ্ছে, ''রুবি-সায়েন্স সিটি, রুবি-সায়েন্স সিটি''।

হঠাৎ একটা ছোট প্লেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার থেকে যে লোকটা এসে নামল সে প্যালাকে বলল, ''আপনি কি প্যালারাম দাসের কোন বংশধর?''

প্যালা খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''কেন বলুন তো?''

''আজ্ঞে তেমন কিছু না। আসলে আপনার মুখটা তাঁর সঙ্গে খুব ম্যাচ করছে কিনা, তাই....

''আপনি চেনেন তাকে?''

''আরে ওনাকে কে না চেনে। আমরা তো ইতিহাসে ওনার কথা পড়েছি।''

''ইতিহাস বইতে! কেন?''

''কেন আপনি জানেন না? উনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কত বড় কাজ করে গেছেন।''

প্যালা দুই ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে বলল, ''আমিই সেই প্যালারাম দাস। যার নাম ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা আছে।''

''আপনিই সে-এ-এ-ই!''

''আচ্ছা আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?''

''হ্যাঁ-হ্যাঁ। বলুন না। আপনার মতো মহাপুরুষের সঙ্গে কথা বলা তো পরম সৌভাগ্যের কথা।''

''এই এক হাজার বছরে পৃথিবীর কি কি পরিবর্তন হয়েছে একটু কাইন্ডলি বলবেন?''

''নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।''

এবার লোকটা বলতে শুরু করল, ''আপনাদের সময় থেকে এখন তো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন ধরুন — ঘরে ঘরে S.V. এসে গেছে।''

''S.V. টা কী?'' জিজ্ঞাসা করল প্যালা।

''আজ্ঞে আপনাদের সময় ছিল টেলিভিশন যাকে আপনারা বলতেন T.V. আর এখন এসে গেছে সুপার ভিশন যাকে আমরা বলি S.V. তারপর আপনাদের সময় আপনারা হাতে ঘড়ি পরতেন আর এখন আমরা হাতে কম্পিউটার পরি। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে সাইকেল ছিল, আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে জেট বাইক আছে।''

''জেট বাইকটা কী?''

''ওই যে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।''

''আচ্ছা-আচ্ছা। আর কী কী হয়েছে?''

''আপনারা বাসে, ট্রেনে, ট্রামে যাতায়াত করতেন, আর আমরা প্লেনে যাতায়াত করি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার আপনাদের সময়ে আপনি ভবিষ্যতে গিয়ে আর ফিরতে পারেননি, আর আমরা যখন তখন গিয়ে আবার ফিরেও আসতে পারি।''

''আর একটা কথা বলুন তো, আকাশে তিনটে সূর্য কেন?'' জিজ্ঞাসা করল প্যালা।

''আরে ওখানে তো একটা সূর্যই আছে। বাকি দুটো কৃত্রিম সূর্য। আসলে কী হয়েছে, সূর্যটার আলো দিন দিন কমে যাচ্ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা আরও দুটো সূর্য বানিয়ে দিয়েছে।''

''কিন্তু কৃত্রিম সূর্য কি বানানো সম্ভব?''

''কেন না? আপনাদের সময়ে তো কৃত্রিম গ্রহ তৈরি হয়েই গিয়েছিল। আর এই এক হাজার বছরে মাত্র দুটো নক্ষত্র তৈরি হবে না?''

প্যালা ভাবল ভারত যদি এত উন্নতি করে তো অ্যামেরিকা কত উন্নতি করেছে। সে কথা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করতেই লোকটা বলল, ''আরে অ্যামেরিকা তো এখন সবচেয়ে গরিব দেশ।''

''কী! কীভাবে হল?'' শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল প্যালা।

''আর বলবেন না। শেয়ার মার্কেটে ডাউন খেয়ে অ্যামেরিকার এই অবস্থা। এখন তো পুরো দেশটাই লোনের উপর চলছে।''

''বাবা! অ্যামেরিকার মত বড় দেশকে এত লোন দিচ্ছে কে?''

''কেন, ভ্যারট।''

''সেটা আবার কে?''

''আরে, ভারতের বর্তমান নাম।''

''ভারত!''

''হ্যাঁ, ভারতের বর্তমান নাম।''

এসব কথা শুনতে শুনতে প্যালার মাথা ঘুরতে লাগল। হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে ডাকছে। ভালো করে শুনে দেখল মামা ডাকছে। সে ভাবল, ''আরে, মামাও কি পিছন পিছন ভবিষ্যতে চলে এল নাকি!''

কিছুক্ষণ পর কে যেন প্যালার মুখে জলের ছিটা দিয়ে দিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখে মামা ডাকছে, ''এই প্যালা ওঠ্। এখনও ঘুমাবি? রেজাল্ট আনতে যাবি না?''

Mistake

Sourav Adhikari
Dept. of Pol. Science

That day the man in his white shirt with black hair, crossed through fields of millet, oats and wheat. The man buried to his shoulders in their depths, head moving along above the feathery waves seemed to float upon a calm sea. He entered the farm through a wooden gateway built on the slopes shaded by rows of trees. But suddenly the man became motionless, as he was passing a window, powerless from fright. A girl came in front of him. For a few seconds both of them looked at each other and wanted to convey a message that they had a relation for a long time. The man slowly moved his eyes from the girl's face and went off with a feeling of attraction and love in his mind for that unknown girl. For the next few days the man could only think of those innocent eyes, that beautiful face, which he saw in front of the window. One day, at night there were black clouds in the sky, the atmosphere was calm and quiet. It seemed to convey that some thing was going to happen at night. The man took a chair and sat in the balcony, for a few seconds. The man closed his eyes and tried to recall his past. Suddenly far from the fairy land he heard a voice calling him – "Father" .... the man opened his eyes and he saw that his little daughter was standing in front of him with a smile on her face. He tried to touch her, but he failed. Next morning he again saw that girl, who was in front of the window, the girl came to him, they had a conversation with each other. A Father – daughter relation had developed between them. One day when the man again came to see the girl, he saw another man was talking to her. The girl saw him and introduced that man as her "Father".

Suddenly a feeling of loneliness came in his mind, he moved slowly away from them and went to his house. He took a chair again and sat, closed his eyes, thought that it was the day when he lost his beloved little daughter. He had mistaken that unknown girl as his little daughter.

Tears rolled down from his eyes, he told himself that – the dead never returns .....!!